দাম : বারো টাকা

মাইকে আজান কোনো মৌলিক অধিকার নয়, জানাল এলাহাবাদ হাইকোর্ট
— পৃঃ ৩৫

স্বস্তিকা

পুতুল ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা জানল না এই প্রজন্ম
— পৃঃ ২৪

৭৪ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ৩০ মে, ২০২২।। ১৫ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

খেলনার বিবর্তন

কতটা প্রভাব ফেলছে শিশুমনে

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৩০ মে - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'আদালতে সততা, কাঠগড়ায় মমতা'
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

চিটার টিচার □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

দেশদ্রোহিতা আইন বাতিলে ভারতের সময়োপযোগী উদ্যোগ □ রবিশঙ্কর প্রসাদ □ ৮

সুষ্ঠু নীতির অভাবেই রাজ্যে চাকুরির পরীক্ষা বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে □ বিশ্বামিত্র □ ১০

ভারতে ইসলামীকরণের তত্ত্ব ও পূর্ববঙ্গে ইসলামের আধিক্যের কারণ অনুসন্ধান □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ১১

সরকারি কর্মীদের প্রতি উদাসীন সরকার
□ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ১৪

বাংলাদেশে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে হিন্দু বিতাড়নের পরিকল্পনা □ রঞ্জন কুমার দে □ ১৫

কেমন ছিল হরপ্পার ধর্ম ও ভাষা □ দেবাশিস চৌধুরী □ ১৭

খেলতে খেলতে ভুলের ফাঁদে
□ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় □ ২৩

পুতুল ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা জানল না এই প্রজন্ম
□ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৪

শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট বিকেলগুলো
□ চন্দ্রভানু ঘোষাল □ ২৬

দেশীয় উদ্যোগের সামনে নজজানু চীনা দৈত্যের খেলনা
□ নিখিল চিত্রকর □ ২৭

জামাইষষ্ঠী শুধুই পঞ্জিকায় □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম মানবীবোমার উদ্ভাবক বীরাঙ্গনা ভেলু নাচিয়ার □ উত্তম মণ্ডল □ ৩৩

পানিহাটির দণ্ড মহোৎসব □ সপ্তর্ষি ঘোষ □ ৩৪

মাইকে আজান কোনো মৌলিক অধিকার নয় জানিয়ে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৩৫

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে নিজেকেই নিজে সম্মানিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় □ জয়দীপ রায় □ ৪৩

মহিলা ক্ষমতায়নের জন্যই জেন্ডার বাজেটিং যোজনা
□ নীলাঞ্জনা রায় □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
৬ জুন
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৬ জুন
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জ্ঞানবাপীর আড়ালে

ভারতের বেশিরভাগ মসজিদ কি তৈরি করা হয়েছিল কোনো না কোনো মন্দির ভেঙে? বাবরি মসজিদের নীচে রামজন্মস্থান মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্প্রতি জ্ঞানবাপী মসজিদের ভেতর থেকেও পাওয়া গেছে শিবলিঙ্গ। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের সম্পূর্ণ আপডেট। লিখবেন বিনয়ভূষণ দাশ, দুর্গাপদ ঘোষ, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার পাঠক, গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের জানানো হচ্ছে যে, বিশেষ কারণবশত আগামী ৪ জুলাই, ২০২২ সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র প্রতি কপির মূল্য ১৬.০০ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭০০.০০ টাকা করা হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হলো, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আশাকরি আপনারা আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

আগামী জুলাই মাস থেকে স্বস্তিকায় দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় পাঠাবেন—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**
Sreemani Market Branch, Kolkata - 700 006

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শিশুরা ফিরিয়া পাক তাহাদের শৈশব

বর্তমান প্রজন্মের কিশোররা বাড়ি, দুড়ি, তেড়ি, চাঘল, চম্পা, ঝোঁক, মেকা— এই শব্দগুলির সঙ্গে একেবারেই পরিচিত নহে। তেমনই কিশোরীদেও এক্কা, দোক্কা, তেক্কা, চৌকা, পাক্কা, লাঠি শব্দগুলির সম্পর্কেও কোনো ধারণা নাই। ইহার দায় অবশ্য তাহাদের নহে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়নের যুগে আর মোবাইল ফোনের দৌলতে বদল হইয়া গিয়াছে প্রেক্ষাপট। শহরে উন্মুক্ত মাঠের অস্তিত্ব নাই, গ্রামাঞ্চলে থাকিলেও সময় শৈশবের কোমলতাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। এখন কিশোর-কিশোরীদের স্মার্ট ফোন বা কমপিউটারের স্ক্রিন হইয়াছে খেলার মাঠ। তাই হারাইয়া গিয়াছে পরম্পরাগত খেলাগুলি। খেলাগুলিতেই তাহাদের শৈশব হইত পরিপুষ্ট। তাহারা হইয়া উঠিত প্রাণবন্ত। খেলাগুলি এক-একটি গ্রামকে পারিবারিক বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিত। কিন্তু হায়, সেই দিন আর নাই। তাই বর্তমান প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীরা জানে না ডাংগুলি, পিট্টু, এলাটিংবেলাটিং, ইচিংবিচিং, ওপেনটি বায়োস্কোপ, কানামাছি, এক্কাদোক্কা বা কিতকিত। জানে না গোল্লাছুট, হাডুডু ,গাদি, মার্বেল, ষোলোগুটি, মোগর লড়াই, লাটিম প্রভৃতি আরও আরও বহু খেলা। ক্রিকেট আসিবার পর গ্রামবাঙ্গলার জনপ্রিয় খেলা ডাংগুলি বিলীন হইয়াছে। তেমনই পুকুর বা নদীতে স্নানের ঘাটে কত রকমের জলক্রীড়ার কথা জানেই না আজকের প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীরা।

খেলার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হইয়াছে খেলনারও। আজ মাটির, কাঠের, বাঁশের, বেতের বা শোলার তৈরি খেলনা ব্রাত্য হইয়া পড়িয়াছে। আজিকার ব্যাটারি চালিত , রিমোট নিয়ন্ত্রিত খেলনার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারিবার ফলে সেইগুলি সংগ্রহশালায় স্থান লইয়াছে। তাহার মধ্যে যতটুকু খেলানা আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে সেইটুকুও অধিকার করিয়া লইয়াছে বিদেশি বিশেষ করিয়া চীনা খেলনা। এই খেলনাগুলি আসিবার ফলে শুধু দেশীয় কারিগররা কর্মহীনই হননি, ভারতীয় শিশুদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও ঝুঁকি স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এই খেলনাগুলি কোনোভাবেই নিরাপদ নহে। খেলনার ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ শিশুর শরীরে নানারকম দুরারোগ্য রোগের সৃষ্টি করিয়াছে। তথাপি অভিভাবকরা শিশুদের হাতে তাহা তুলিয়া দিতেছেন। ইহার সঙ্গে জুটিয়াছে অনলাইন গেম বা ভিডিয়ো গেমস। ইহাও আমাদের দেশের খেলনাশিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্য বহুলাংশে দায়ী। অনলাইল গেমসের মোহে পড়িয়া কচিকাঁচারা শুধু সময়ই নষ্ট করিতেছে না, ইহাতে তাহাদের শারীরিক ও মানসির স্বাস্থ্যেরও অবনতি হইতেছে। শিশু-কিশোরদের প্রবল ভিডিয়ো গেমসের আসক্তিকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মানসিক রোগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। কিন্তু অভিভাবকরা নির্বিকার। তাহারা নিজের পরিবারের বিষয়েই উদাসীন; দেশ-জাতি-সমাজের বিষয় তো দূরের কথা!

ইহার মধ্যেই সুখের বিষয় হইল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নূতন শিক্ষানীতিতে শিশু-কিশোরদের শৈশব ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য দেশীয় খেলা ও খেলনা উপর জোর দিয়াছে। ইহার জন্য আলাদা মন্ত্রকও তৈরি হইয়াছে। বিদেশি খেলনা যাহাতে ভারতের বাজার দখল করিতে না পারে তাহার জন্য খেলনাশিল্পেও আত্মনির্ভর হইবার কথা বলিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। ভার্চুয়াল গেমের জন্য দেশীয় গেমিং অ্যাপ তৈরি করিবার কথা বলিয়াছেন। শৈশবের চাহিদা খেলা ও খেলনা। শিশু-কিশোরদের ভিডিয়ো গেমের আসক্তি হইতে বাহির করিয়া খেলার মাঠে ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব অভিভাবকদের। শিশুরা দেশীয় খেলা ও খেলনায় আবার মগ্ন হইয়া উঠুক, তাহারা ফিরিয়া পাক তাহাদের শৈশব— এই কামনাই হউক সবার।

সুভাষিতম্

অঙ্গণবেদী বসুধা কুল্যা
জলধিঃ স্থলী চ পাতালম্।
বল্মীকশ্চ সুমেরুঃ
কৃতপ্রতিজ্ঞস্য ধীরস্য।। (হর্ষচরিতম্)

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সমগ্র পৃথিবী তাঁর বাড়ির উঠোনের মতো, অতল সাগর একটি খালের মতো, পাতাললোক একটি বাগানের মতো এবং সুমেরু পর্বত তাঁর কাছে একটি উইপোকার ঢিবির মতো প্রতীয়মান হয়।

আদালতে সততা, কাঠগড়ায় মমতা

একসময় বাঙ্গলা কাঁপিয়েছিল সংবাদ শিরোনাম 'আদালতে দিলীপ, কাঠগড়ায় সুভাষ'। সিপিএম বাহুবলী দিলীপ গ্রেফতার হওয়ায় অভিযোগ উঠেছিল মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর দিকে। বলা হয়েছিল দলের পাল্টা গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে সুভাষবাবুর বরাতে করাত চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টচার্য। ২০১১ সালে ডি এম কে হয়ে যায় 'টি এম কে' বা 'তিহার মুনেত্রা কাজকম'। দুর্নীতির দায়ে দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা তিহার জেলে চালান হন। সম্প্রতি কলকাতা বাইপাসের ধারে খুলেছে নতুন তৃণমূল ভবন। অনেকে বলছেন, আগামীতে এই ভবনের নাম হবে 'আলিমুল ভবন'। আলিপুর জেলের নামে নাম হবে তৃণমূল ভবনের। দাবিটা বাড়াবাড়ি, তবে সারবত্তা নেই বলব না। তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আগামীতে সামনের সারির অর্ধেক নেতা যদি জেলের ঘানি টানেন অবাক হব না। এর মধ্যেই বিজেপি ছেড়ে ঘরে ফিরেছেন তাদের পুরনো বাহুবলী ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংহ। অঙ্কটা তিনি জানেন। কানাঘুঁষো চলছে, হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ঘর ওয়াপসি হবেন। মহাভারত বলেছে, 'পাপের ঘর বড়।' কৌরবরা একশো ভাই হয়েও পাণ্ডব পাঁচ ভাইয়ের কাছে হেরে যায়। এই মুহূর্তে তৃণমূলের অন্তত ১৫ জন নেতা মন্ত্রীর অবৈধ কাজের তদন্ত চলছে। রয়েছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কেন্দ্রীয় চক্রান্তের জিগির তুলে তৃণমূল বালিতে মাথা ঢুকিয়ে রেখেছে। সারদা চিট ফান্ড আর নারদ ঘুষ কাণ্ডে ২৩ নেতা আর সাংসদের বিরুদ্ধে এফ আই আর রয়েছে। আশ্চর্য, কেউ সাংসদ পদ খোয়াননি। অভিযুক্তদের মধ্যে জাতীয় কমিটির নেতা ৪ জন। ধরা পড়ে ৩ জন জেল খেটেছেন। একজন মারা

গিয়েছেন। এরপরেও মমতা দুবার রাজ্য নির্বাচন জিতেছেন। আসন সংখ্যা আর ভোট ব্যাংক বাড়িয়েছেন। সিপিএম যে কায়দায় ৭টি নির্বাচন জিতেছিল মমতা নাকি সেই কায়দায় জিতছেন। মমতার নেতারা এখন 'কোর্ট ঘর আর জেল ঘর' করছেন। গোটা তৃণমূল আদালতে সততার পরীক্ষা দিচ্ছে। আর মমতা প্রধান অভিযুক্ত। তিনি কাঠগড়ায়। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট জিততে জেলা সফরে বেরিয়েছেন মমতা। লজ্জায় মুখ ঢেকে হ্যামলেটের সলিলোকি ভুলে চিৎকার করছেন 'আর নয়। অনেক মার খেয়েছেন। আপনাদের পাপ আমি নেব না।' মনে হয় ঋষি বাল্মীকির পরিবার। তিনি নিজেই বাল্মীকি। ভাবটা 'চুলোয় যাক পার্থ, দুই পরেশ আর অনুব্রতরা। আমি সিংহাসনচ্যুত যেন না হই।' মমতা ভালোই জানেন, মাছ পচার আগে মুড়ো পচে। তিনি সেই মুড়ো। ২০১৩ থেকে কেলেঙ্কারি আর দুর্নীতি তৃণমূলের ভাই। দলের নেতা মন্ত্রীরা হয় পালাচ্ছেন নয় গা ঢাকা দিচ্ছেন। প্রমাণ করেছে 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' মামুলি কথা নয়। কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্ষমতালিপ্সু তৃণমূল নেতারা ভুলে গিয়েছেন, 'সিপিএম বিজয়' আর 'বিজেপি রোধ' হয়েছিল মমতার হাতে। তারা ফেউ। তৃণমূলের এক সর্বভারতীয় নেতা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'দে বিট দ্য হ্যান্ড দ্যাট ফেড দেম।' যে হাত তাদের খাইয়েছিল সেই হাতেই তারা কামড় বসিয়েছেন। এর জন্য মমতা দায়ী। সিপিএম নিধনের পর যেন তেন প্রকারে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখেন মমতা। সে দুর্বলতার ফসল তুলেছে তৃণমূলের অপদার্থ কিছু নেতা। অনেকে ঠাট্টা করে বলেন, 'নেত্রী নিদ্রা গেছেন শুনতে পাবেন না।' মমতা লড়াকু (অমিত শাহ আজ যা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন) আবার মমতা 'যশাকাঙ্ক্ষী আর যশলোভী'। কংগ্রেসের এক নামজাদা নেতা (পরে মমতা রাজ্যে মন্ত্রী হন) তাকে হেনস্থা করতে বস্তা চাপা মরা কুকুরের গলায় মালা পরানোর ফন্দি আঁটে। মমতা সে ফাঁদে পা দেন। দল গঠনের পর তৃণমূল সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম প্রধান পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় মমতাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু মমতার ক্ষমতার লোভ কমেনি। উত্তরোত্তর বেড়েছে। মমতার আত্মজীবনী 'জীবন সংগ্রাম' পড়লে তার অব্যক্ত বেদনা আর কিছু খুচরো লোভের ধারণা হয়। তাই লিখেছেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু মানুষ সবটাই অতিরিক্ত পান।' আয়নায় আজ মমতাই সে মানুষ। তাই তাঁর দল সততার আদালতে। আর তিনি কাঠগড়ায়। □

চিটার টিচার

সুন্দর মৌলিক

ম্যানেজ মাস্টারেষু দিদিভাই,

আপনি পারেন। আপনিই পারেন। টিচার। মানে শিক্ষক। বলা হয়, তাঁরাই মানুষ তৈরির কারিগর। সেই টিচার শব্দটিকে আপনি বদলে দিলেন। টিচার হয়ে গিয়েছে চিটার। মন্ত্রীকন্যা অঙ্কিতা তো একটা উদাহরণ। দিদি, আমরা জানি, এখন স্কুলে স্কুলে যে শিক্ষক, শিক্ষিকারা রয়েছেন তাঁর সকলে নন, কিন্তু অনেকেই অন্যকে টপকে চাকরি পেয়েছেন। কেউ টাকার জোরে, কেউ যোগাযোগের জোরে।

তবে দিদি আপনার আমলে এটা প্রথম নয়। এর আগে বাম আমলেও এমনটাই হতো। আকছার হতো। আপনিই কয়েকদিন আগে বলেছেন, চিরকুটে চাকরি হতো। আপনি ঠিকই বলেছেন। কমরেডরা ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময়ে ব্যাগে একটা 'গণশক্তি' রাখতেন। কাগজপত্র বার করার সময়ে সেই 'গণশক্তি' বেরিয়ে এলেই বোঝা যেতো ইনি 'পার্টি কোটা'-র ক্যান্ডিডেট। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। আরও নানা ভাবে হতো। সিপিএম-এর একটা অলিখিত নিয়ম ছিল। কেউ দলের হোলটাইমার হলে তাঁর স্ত্রী বা স্বামীকে স্কুলে চাকরি দিয়ে দেওয়া হতো। দরকারি ডিগ্রি না থাকলে নানা ভাবে কর্মশিক্ষা কিংবা শারীরশিক্ষার শিক্ষক করে দেওয়া হতো। এছাড়াও বেসরকারি জায়গাতেও এমন চাকরির ব্যবস্থা ছিল। তারাই আবার ওই বেসরকারি সংস্থা বা কলকারখানায় ঢুকে ইউনিয়ন করতেন। তারপরে কোম্পানি তোলার ব্যবস্থা করতেন। এমন উদাহরণ মুড়ি-মুড়কির মতো। আসল লক্ষ্যই ছিল সেটা। তবেই না কর্মীরা বিপদে পড়বেন। আর কর্মীরা বিপদে পড়লেই দলের দাসানুদাস হয়ে থাকবেন।

তবে সে সবকে আপনার আমল টপকে গিয়েছে। এখন 'গণশক্তি'র মতো 'জাগো বাংলা' রাখতে হয় না। নেতা, মন্ত্রী এমনকী মন্ত্রীরাও নিজেদের সরকারি প্যাডে তালিকা বানিয়ে দিয়ে দেন। কোথায়, কাকে, কোন পদে নিতে হবে। অমান্য করার উপায় নেই। যে সরকারি কর্তা অমান্য করবেন তাঁর 'ব্যবস্থা' হয়ে যাবে। দিদিভাই, আপনার আমলে এই ভাবে চাকরিতে ঢোকা অনেকেই এখন বিভিন্ন সংস্থার কর্তাব্যক্তি। তাঁরা যেমন আপনাকে পুরস্কার দেন, তেমনই শিক্ষক থেকে পুলিশ-সহ অন্য চাকরিতে নিয়োগ করেন। রাজ্যে সিভিক ভলেন্টিয়ার নামক চাকরিতে একশো শতাংশ দলের লোক ঢোকানোর রেকর্ড হয়েছে। একই ভাবে শহরে বা গ্রামে সরকারি প্রকল্পে দলের লোকেরাই কাজ পেয়েছেন। এটাও বাম আমলে ছিল। সত্যিই দিদি, আপনি সিপিএমের যোগ্য ছাত্রী।

> সিই এসসি-র মতো বেসরকারি সংস্থা আপনার কথা মতো নিয়োগ করে। বিনিময়ে তারা ইচ্ছা মতো বিদ্যুতের দাম বাড়ায় আর তাতে আপনি সায় দিয়ে দেন। বোঝাপড়ার এমন নজির দুনিয়ায় পাওয়া যাবে কি! জানি না। এই জন্যই আমার নিজের রাজ্য, নিজের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এত গর্ব।

অনিল বিশ্বাসকে বলা হতো বাঙ্গলার অলিখিত উপাচার্য। কোনো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে নিয়োগ হবে সব তিনি আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে বসে নিয়ন্ত্রণ করতেন। একজন শিক্ষাকর্ত্রীকে তিনি 'ভ্যানিস'-ও করে দিয়েছিলেন। আর আপনার জমানায় কী হয়েছে তা একটু একটু করে সামনে আসছে। দিদি, আপনিও জানেন, আমিও জানি যে এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। শুধু তো চাকরি নয়, বদলিতে স্বজনপোষণ আর টাকার খেলা নিয়ে তদন্ত হলে তো কিছুই চাপা থাকবে না।

দিদি আপনার এই ক্ষমতা দেখে শত শত প্রণাম। সেদিন বাঙ্গলার এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনিই জানালেন, এই রাজ্যে কোনো সংবাদমাধ্যম কাকে মাথায় বসাবে, কাকে চাকরিছাড়া করে দেবে সেটাও নাকি আপনিই ঠিক করে দেন। সেই কারণেই, বাঙ্গলার বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যমের মাথায় আপনার ভাইয়েরা। আবার যাঁদের একটু বেশি পছন্দ তাঁদের আপনি নানা ভাবে সরকারি চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ সরাসরি আপনার দপ্তর মানে মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ে রয়েছেন। তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলছি না। কিন্তু আর কেউ যোগ্য ছিল না এমনটাও মানতে পারছি না।

আপনি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখনও একই কাজ করেছেন। কলকাতা মেট্রোয় তো অনেক নিয়োগ হয়েছে। এমনকী সিইএসসি-র মতো বেসরকারি সংস্থা আপনার কথা মতো নিয়োগ করে। বিনিময়ে তারা ইচ্ছা মতো বিদ্যুতের দাম বাড়ায় আর তাতে আপনি সায় দিয়ে দেন। বোঝাপড়ার এমন নজির দুনিয়ায় পাওয়া যাবে কি! জানি না। এই জন্যই আমার নিজের রাজ্য, নিজের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এত গর্ব।

দিদি, সবে চাকরি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। অন্য ভাবে টাকা খেয়ে কে কী করেছেন তার ফিরিস্তিও নাকি বের হতে চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আজকাল কিছুই তো চাপা যায় না। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে তৃণমূল নেতারা কীভাবে বিন্দু থেকে সিন্ধু হয়েছেন তার তালিকাও সামনে এল বলে। তবে আমি জানি, আপনি ঠিক সামলে নেবেন।

আপনার উপরে আমার অগাধ বিশ্বাস। আপনার মতো ম্যানেজ মাস্টার দুনিয়ায় নেই।

অতিথি কলম

রবিশঙ্কর প্রসাদ

দেশদ্রোহিতা আইন বাতিলে ভারতের সময়োপযোগী উদ্যোগ

দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানগুলি মজবুত ও সংহত হওয়ায় কোন কাজটি দেশদ্রোহিতার আওতায় পড়ে আর কোনটি নয় তা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাদের নিশ্চয়ই রয়েছে। সে কারণে ঠিক কোন আইনটি এখানে প্রযোজ্য হবে এবং এর অপব্যবহার হবে না সরকার তা নিরীক্ষণ করে দেখবে।

সম্প্রতি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে বিচারাধীন একটি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে অবশ্যই তার পরিধির মধ্যে প্রবেশ না করে প্রধানমন্ত্রী মোদী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বৃহত্তর প্রেক্ষিতে অভিযুক্তের মানবাধিকার, সাধারণ নাগরিক অধিকারের মর্যাদা ও সামগ্রিকভাবে ভারতের নাগরিকদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলি যাতে সুরক্ষিত থাকে সে বিষয়ে যত্নবান হতে বলেছেন।

এই সূত্রে দেওয়া একটি হলফনামায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ও সরকারের তরফ থেকে যে হলফনামা দিয়েছেন, তা পাঠ করলে উজ্জীবিত হওয়ার পর্যাপ্ত কারণ থেকে যায়। তিনি বলেছেন, ''ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো দেশের অভ্যন্তরে নানাবিধ চিন্তাধারা ও মতের সুন্দর ও সুষম বিকাশ।''

দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে আমরা যখন 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' পালন করছি সে সময় আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা যেন নিজেদের সবটুকু দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করি যাতে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক বোঝা সহজে ঝেড়ে ফেলা যায়। হ্যাঁ, এরই মধ্যে পড়ছে ঔপনিবেশিক বহুবিধ ঔপনিবেশিক আইন এবং আজকের তারিখে তার প্রয়োগ। এগুলি নিছকই কতকগুলি ফাঁকা তাৎক্ষণিক শব্দগুচ্ছ নয়। উল্লেখ্য, তাঁর নেতৃত্বের ৮ বছরের সরকার ইতিমধ্যেই ঔপনিবেশিক আমলের ১৫০০টি আইন বিলুপ্ত করেছে। ২৫ হাজার মান্য করতেই হবে এমন কিছু সরকারি অনুশাসনের বাধ্যবাধকতা যা সরকারি কাজ বাস্তয়িত করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছিল সেগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এমন কিছু খুচরো অপরাধের আয়ত্তাধীন ধারা যেগুলি দেশের উন্নয়নকে ব্যহত করছিল সেগুলিকে এখন আর অপরাধমূলক বলে গণ্য করা হচ্ছে না। আলোচ্য হলফনামাটিতে আরও একটি মহান উদ্দেশ্যমূলক ঘোষণা রয়েছে-- ''যে সমস্ত আইন ও তাকে মান্যতা দেওয়া আজকের স্বাধীন ভারতে কোনোওভাবে ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিচয় দেয় সেগুলির আর কোনো স্থান নেই। তাদের বিদায় করতে হবে''।

এই পটভূমিতেই সরকারের তরফে জানানো হয় যে তারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ যা দেশদ্রোহিতার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় সেটিকে পুনর্বার বিবেচনা এবং আইনজ্ঞদের

> **"দেশকে বিগত কয়েক বছর ধরে ভাগ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। একই সঙ্গে মহামান্য আদালতও পরিস্থিতির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করে আইনটি পর্যালোচনা করার জন্য সময় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রেও অন্তর্বর্তীকালীন নিরপত্তারও নিদান দিয়েছেন।"**

মতামত ও পরামর্শের আলোকে বিশ্লেষণ করবে। ভারতে দেশদ্রোহিতা আইনের ইতিহাস অতি বিচিত্র। ইংরেজ রাজত্বকালের শুরু থেকেই এটি ফৌজদারি আইনের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। ইংরেজ সরকার আইনটি প্রণয়ন করার সময় বিভিন্ন অপরাধীকে চিহ্নিত করেছিল। এক্ষেত্রে দেশদ্রোহিতাকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। যার পরিণামে শাস্তি হিসেবে আজীবন কারাবাস ও মোটা অঙ্কের টাকা একইসঙ্গে জরিমানা হিসেবে আদায় করা হতো। এক্ষেত্রে দেশদ্রোহিতার সংজ্ঞাটি ছিল কিছুটা ভাসা ভাসা। সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিরূপতা জাগতে পারে, কোনও রকম ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে, এই ধরনের কোনও বক্তব্য থাকলেই তাকে দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করা হতো। এইরকম সরকারের প্রতি বিরূপ বা বিক্ষুব্ধ মানসিকতাকে অনানুগত্য (ডিসলয়ালিটি) ও শত্রুতার মনোভাব বলেই গণ্য করে দেশদ্রোহিতা আইন প্রয়োগ করা হতো। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের ওপর ইংরেজের বজ্রমুষ্ঠি ও নিয়ন্ত্রণ বরাবরের জন্য দৃঢ় করা। এই আইনে কোনো ব্যত্যয় হলেই তা দেশদ্রেহিতার আওতায় পড়ে যেত।

এই কারণেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বড়ো বড়ো নেতাকেই এই আইনের টার্গেট করা হতো। নমস্য বালগঙ্গাধর তিলকই পরাধীন ভারতে এই আইনের প্রথম বলি। ব্রিটিশ সরকার ভেবেছিল, তিলক সম্পাদিত 'কেশরী' মরাঠি সংবাদপত্র এবং যেখানে তাঁর লেখালেখি দেশবাসীর মনে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বিরূপতা জাগিয়ে তুলছে। অতএব দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ১৮ মাস কারাদণ্ড। এমনকী ১৯২২ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধীজীর লেখা 'মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা জাগানোয় উসকানি দেওয়ার জন্য' ৬ বছরের কারাদণ্ড হয়। এমনই আরও অনেককেই দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া হয়।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংবিধান যখন তৈরি হচ্ছিল সেই ১৯৪৮ সালের ১ ডিসেম্বর কে এম মুন্সি একটি সংশোধনী এনে দেশদ্রোহিতার ধারণাটিকে বাদ দিতে বলেন। তিনি বলেন, ' অ্যাজ কনস্টিটিউটিং এ রেসট্রিক্টশন অন রাইট টু ফ্রিডম অব স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশান পার্টিকুলারলি ইন দ্য কনটেক্সট অব দ্য পেইনফুল এক্সপিরিয়েন্স টু পানিশ ইন্ডিয়ানস বাই দ্য ব্রিটিশ অথোরাইটস ফর ইভেন ইননোকিউয়াস এক্সপ্রেশনস অ্যান্ড ক্রিটিসিজম অব কলোনিয়াল গভর্নমেন্টস''। আজকের ধারা ১৯(১)(এ)(জি) অনাপ্য স্বাধীনতার সঙ্গে বাকস্বাধীনতা ও অভিব্যক্তি, অন্যদিকে ১৯(২) থেকে ১৯ (৬)-তে এইন স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহারের উপর যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, এই যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়টির ক্ষেত্রে কোথাও কিন্তু দেশদ্রোহিতার অপরাধের প্রসঙ্গ নেই। দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি যাতে সুরক্ষিত থাকে অবশ্যই সে বিষয় আছে। আছে নাগরিক সমাজের নিরাপত্তার বিষয়টিও, কিন্তু দেশদ্রোহিতার কথা নেই। এটি গেল সংবিধানে লিখিত বিষয়ের কথা। কিন্তু ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির (ইন্ডিয়ান পিনাল কোড) ক্ষেত্রে দেশদ্রোহের বিষয়গুলি রয়ে গেছে। এবিষয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের রায় রয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ ১৯৬২ সালে 'কেদারনাথ শিব ও বিহার রাজ্য সরকার' মামলায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রায় দিয়েছেন, '' যদি না নিশ্চিত কোনো প্ররোচনায় হিংসার পথ আবলম্বন করার আহ্বান না জানানো হয় তাহলে সরকারের যেকোনো সমালোচনাকে কখনোই দেশদ্রোহিতা বলা যাবে না।''

ব্রিটিশ আমলের এই দেশদ্রোহিতামূলক আইনটির অপব্যবহার নিয়ে অজস্র সঠিক আলোচনা হলেও এবং কেন এটি আমাদের আইনে থাকবে তা নিয়ে বিতণ্ডা হলেও কংগ্রেস দল ৬০ বছর একচ্ছত্র ভারত শাসন করলেও এটি বাতিল করার কথা ভাবেনি। আপনারা সকলেই জানেন, এই আইনের যথেচ্ছ অপব্যবহার হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, যার মূলে আছে শাসকের গদি নিরাপদ রাখা। অতি সম্প্রতি একটি রাজ্যে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে আইনটিকে তছনছ করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারের প্রধানের বাড়ির সন্নিকটে হনুমান চালিসা পাঠ করার চেষ্টাকে দেশদ্রোহিতার আইনে ফেলে দেশের সাংসদ ও বিধায়ককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের কারাবাসও হয়েছে। তাঁদের জামিন নিতে হয়েছে। এমন সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবে আইনটির পর্যালোচনা জরুরি হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই ৭৫ বছরে ভারত একটি প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনি— প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ শক্তিশালী ও সংহত, সে কারণে দেশে দেশদ্রোহিতার অপরাধ কীভাবে গণ্য হবে এবং কী কী বিষয় এই অপরাধের আওতাধীন থাকবে, তা মুক্তমনে যুক্তিগ্রাহ্য ও নিরপেক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণ করার পূর্ণ মেধা তার রয়েছে।

দেশদ্রোহিতার আইন যদি বহাল থাকেও সেক্ষেত্রে সেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী নির্দেশিকা থাকতে হবে এর অপব্যবহারের বিষয়ে। একেবারে নির্দিষ্ট করে আইনে নথিবদ্ধ করতে হবে ঠিক কী কী কারণে বিষয়টি দেশদ্রোহিতা আইনের আওতায় আসবে, কখন এটির প্রয়োগ নিতান্তই অপরিহার্য হবে। পুরনো ১৫০০টি আইন বাতিল করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রকরণ অনুসৃত হয়েছে তার ওপর প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। যে সমস্ত কাজ অতীতে ফৌজদারি অপরাধ ছিল, তাকে অফৌজদারি করেছেন। অজস্র উন্নয়নে মেধা সৃষ্টিকারী আবশ্যক আধা আইনি খুটিনাটিও অবলুপ্ত করার ক্ষেত্রে সংঘাতহীন ও প্রয়োজনীয় আলোচনা প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন।

এই ব্যবস্থাটিই ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি। আমি নিশ্চিত সেই পন্থাই 'দেশদ্রোহিতা বিলোপ আইন' পর্যালোচিত হবে। যেখানে সকলের পরিতুষ্টি, যেমন মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা, সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, যারা ভারতকে ভাঙবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাদের শায়েস্তা করারও উপযুক্ত বিধান থাকবে। এই আদান-প্রদান ও ব্রেন স্টর্মিং করে সঠিক পথ নির্ধারণের ক্ষমতা আধুনিক ভারত ও তার নেতৃত্বের আছে। সবশেষে, আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলতে চাই, দেশকে বিগত কয়েক বছর ধরে ভাগ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। একই সঙ্গে মহামান্য আদালতও পরিস্থিতির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করে আইনটি পর্যালোচনা করার জন্য সময় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রেও অন্তর্বর্তীকালীন নিরপত্তারও নিদান দিয়েছেন।

(লেখক পূর্বতন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী)

শোক সংবাদ

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলীর আমন্ত্রিত সদস্য সুনীলপদ গোস্বামীর দাদা দুর্গাপদ গোস্বামী গত ১৪ মে পরলোকগমন করেন। গত ৪ বছর ধরে তিনি কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। গত কয়েক মাস থেকে তাঁর ডায়ালিসিস চলছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ কন্যা, ২ ভাই এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। তাঁর ভাইপো মানস গোস্বামী সিঙ্গাতলা শাখার স্বংসেবক। ১৯৫২ সালে তিনি মালদা নগরে কালীতলা শাখায় স্বয়ংসেবক হন। ছাত্রজীবন থেকে ৪ ভাই একসঙ্গে শাখায় যেতেন। ওকালতি পাশ করার পর মালদা বার অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করে ৫০ বছর লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন।

* * *

কলকাতা মহানগরের স্বয়ংসেবক, অধুনা উত্তর ২৪ পরগনার দুর্গানগর নিবাসী , স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন কর্মী সুবল দত্তের মাতৃদেবী রেণুকাবালা দত্ত গত ১৩ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা তথা দীর্ঘদিনের স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ প্রচার প্রতিনিধি সুধীর চন্দ্র ঘোষ গত ১৪ মে শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

সুষ্ঠু নীতির অভাবেই রাজ্যে চাকুরির পরীক্ষা বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এখন সমস্যা অনেক। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা দুর্নীতি। পশ্চিমবঙ্গবাসীমাত্রই জানেন, এই দুর্নীতির সর্বোচ্চ স্তর বামজমানাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। বামজমানায় শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল অনিলায়ন। অর্থাৎ পার্টির রাজ্য সম্পাদকের অনুগতদের স্কুল কলেজে যথেষ্ট সুযোগ পাইয়ে রাজ্যের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে অলিখিত পার্টি অফিসে পরিণত করা। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের কমিউনিস্ট-সুলভ মগজধোলাইয়ের কাজটাও যেমন চলতো তেমনি আবার রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকেও পুরোপুরি পার্টির কবজায় আনা গিয়েছিল। বর্তমান সরকারও তার পূর্বসূরীকেই হুবহু অনুসরণ করেছে। আর রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের একটা মস্তবড় সুবিধা হলো, এদের যেহেতু আদর্শের কোনো বালাই নেই, তাই দুর্নীতিতেই এদের নেকনজর। দুর্নীতির মাত্রা এতটাই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কলকাতার উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিকে মন্তব্য করতে হয়, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করা উচিত। যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করে উক্ত মন্ত্রীর কন্যা স্কুলশিক্ষার যে চাকরি পেয়েছিলেন, তা তো বাতিল হয়েছেই, উপরন্তু বেতন-বাবদ যে অর্থ তাঁর চাকরি-জীবনে তিনি নিয়ে এসেছেন (প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা) তাও দুমাসের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। অভিযোগ উঠেছে, সেই মন্ত্রীপুত্রের তিনবার মাধ্যমিক ফেল ছেলে নাকি ডাক্তারি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে, এখন একজন চিকিৎসক। মনে রাখা দরকার, এই মন্ত্রীটি কিন্তু পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর শরিকদলের বিধায়ক ছিলেন। রাজ্যের শুধু শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীই নয়, অবৈধ নিয়োগে জড়িত থাকার অভিযোগে খোদ রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, শাসকদলের এক তাবড় নেতাকে উচ্চ ন্যায়ালয় রীতিমতো ভর্ৎসনা করে সিবিআইয়ের কাছে হাজির হয়ে তদন্তে সহযোগিতার আদেশ দিয়েছে।

আগের সরকারের ক্ষেত্রেও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চনা ইত্যাদি ছিল, কিন্তু বিষয়গুলো এতটা বেআব্রু হয়ে পড়েনি, বর্তমান সরকারের আমলে যতটা পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুর্নীতির কথা মোটামুটি সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু আরও একটা সমস্যা ইদানীং মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যেটা রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের সার্বিক পঙ্গুত্বের ছবিটাকেই প্রকট করে। কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পড়ুয়া দাবি করেছে, আসন্ন পরীক্ষা অনলাইনে নেওয়া হোক। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর দাবি, পরীক্ষা অফলাইনে মানে পরীক্ষা হলে সশরীরে উপস্থিত থেকে হোক।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে, রাজ্যে ছাত্রান্দোলনের মান কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। এককালে যে ছাত্রসমাজ দেশের জন্য, দশের জন্য আন্দোলন সংঘটিত করে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতো, তারা আজ কোন অধঃপাতে গিয়েছে যে, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আন্দোলন করছে। বিশেষ করে, অনলাইন পরীক্ষায় যেখানে অন্যায্য সুবিধা নেওয়া যায়, প্রাপ্ত নম্বর বেশি পাওয়ার সুযোগ

> “রাজ্য সরকারের স্পষ্ট পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাব। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, তারা যেন পরীক্ষাব্যবস্থা, পড়াশোনা তুলে দিতে পারলেই বাঁচে।”

থাকে সেই ব্যবস্থার জন্য ছাত্রান্দোলন! ছিছিক্কার দেবার আগে বিষয়টি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার।

স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মোটামুটি সার্টিফিকেট-কেন্দ্রিক করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মেধার গুণগত নির্ণায়ক হলো নম্বর। এই শিক্ষাব্যবস্থার অসারত্ব নিয়ে আলোচনা আগেও হয়েছে, পরেও হয়তো হবে। শুধু আমাদের বলার বিষয়, এই পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা যদি অধিক নম্বরের তাগিদে অনলাইন পরীক্ষা চায়, তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ দেখা গেছে, যদি জনৈক ছাত্র অফলাইন পরীক্ষায় একশোর মধ্যে চল্লিশ পায়, তবে অনলাইনে সেই চল্লিশ নম্বরই প্রায় আটাত্তর নম্বরে পরিণত হবে।

কিন্তু পাশাপাশি এটাও ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় রাখা দরকার ভবিষ্যতে এই অনলাইন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর আদৌ কতটা গ্রহণযোগ্য হবে। মনে পড়বে, কিছুদিন আগে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এ নিয়ে একাধিক রসিকতাও চালু হয়েছিল। সুতরাং শিক্ষকসমাজ যে মূলত অফলাইন পরীক্ষাব্যবস্থার ওপর জোর দিচ্ছেন তার যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে।

একথাও ঠিক, কোভিড পরিস্থিতির এখন যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, সুতরাং অফলাইন পরীক্ষায় এই পরিস্থিতির অজুহাত ধোপে টিকবে না। আসল সমস্যা হচ্ছে, রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে স্পষ্ট পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাব। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, তারা যেন পরীক্ষাব্যবস্থা, পড়াশোনা তুলে দিতে পারলেই বাঁচে। নমুনা দেখুন, গরমের ছুটি। জোর জবরদস্তি সরকারি- বেসরকারি স্কুল বন্ধ করা হলো, এদিকে এখন গরম অনেক কম, বর্ষা আসে আসে অবস্থা। অথচ স্কুল খোলার নামগন্ধ নেই।

পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সরকারের পরিকল্পনার অভাব, সুষ্ঠু নীতির অভাব লক্ষ্যণীয় এবং সেই কারণেই একটা নন ইস্যু রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার মাথায় বসে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। □

ভারতে ইসলামীকরণের তত্ত্ব ও পূর্ববঙ্গে ইসলামের আধিক্যের কারণ অনুসন্ধান

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

ভারতে ইসলামীকরণের প্রাচীনতম তত্ত্ব, 'তরবারির ধর্ম'; ভারতে এবং অন্যত্র ইসলামের প্রসারে সামরিক শক্তির ভূমিকা ছিল। অন্তত ক্রুসেডের সময় থেকে। ১৮৯৮ সালে স্যার উইলিয়াম মুয়ারের লেখা এই লাইগুলিতে চিত্রিত হয়েছে, এর সাধারণ সুর ধরা হয়েছে :

'যুদ্ধের গন্ধ— নেতিয়ে পড়া আরব উপজাতিদের দারুণ উত্তেজিত করে আনুগত্য বাড়িয়ে দিয়েছিল... যোদ্ধার পর যোদ্ধা, কলামের পর কলাম, সমগ্র উপজাতিরা তাদের নারী ও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে অবিরামভাবে একটার পর একটা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে গেছে। এবং কখনও, শহর জয়ের বিস্ময়কর গল্পে তারা উত্তেজিত হয়েছে বা অগণিত লুটপাটে সংগৃহীত সম্পদের কথায় বা যুদ্ধের ময়দানে 'প্রত্যেক পুরুষের জন্য একটি বা দুটি মেয়ে' ভাগাভাগি করেছে... নতুন নতুন উপজাতিরা উঠেছে আবার চলেও গেছে। সামনের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে, মৌচাকের ঝাঁক বা পঙ্গপালের উড়ানের মতো স্থলভূমি অন্ধকার করে, উপজাতির পর উপজাতি বেরিয়ে আসে এবং দ্রুত উত্তর দিকে ছুটে যায়, পূর্ব এবং পশ্চিমে বিশাল জনগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়ে'।

ইসলামীকরণ যদি সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তির ফলে হয়ে থাকে, তবে আশা করা যায় যে যে অঞ্চলগুলি সবচেয়ে নিবিড়ভাবে, দীর্ঘতম সময়ে মুসলমান রাজবংশের শাসনের অধীনে থেকেছে মানে যেগুলি 'তরবারি'-র একেবারে মুখোমুখি উন্মুক্ত ছিল— সেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলমান থাকত। ব্যাপারটা উলটো, কারণ যে সব অঞ্চলে সবচেয়ে নাটকীয় ইসলামীকরণ ঘটেছে, যেমন পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিম পঞ্জাব, সেগুলি ইন্দো-মুসলমান শাসনের বাইরের সীমায় ছিল, সেখানে 'তলোয়ার' সবচেয়ে দুর্বল ছিল এবং সেখানে সবচেয়ে কম নৃশংস শক্তি প্রয়োগ করা হতো।

এইসব এলাকায় আদমশুমারির রিপোর্টে মুসলমান জনসংখ্যা মোটের উপর ৭০ থেকে ৯০ শতাংশের মধ্যে ছিল, অথচ উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমিতে, মুসলমান শাসনের কেন্দ্রস্থলে,— দিল্লির দুর্গ এবং তাজমহলের আশেপাশে— যেখানে মুসলমান শাসন ছিল সবচেয়ে নিবিড়ভাবে এবং দীর্ঘতম সময়ের জন্য মুসলমানরা শাসন করেছে--- সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে। অন্য কথায়, সমগ্র উপমহাদেশে মুসলমান রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের মাত্রা এবং ইসলামীকরণের মাত্রার মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। এমনকী বাঙ্গলার মধ্যেও এই নীতিটি সত্য। ভারতের ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে :

আমাদের যা দরকার তা হলো এমন কিছু তত্ত্ব যা শুধুমাত্র মুসলমান শক্তির কেন্দ্রস্থলে নয়, তার সমগ্র পরিধির মধ্যে ব্যাপক ইসলামীকরণের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং শুধুমাত্র শহুরে অভিজাতদের মধ্যে নয়, লক্ষ লক্ষ কৃষক চাষীদের মধ্যেও।

এই পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলির মধ্যে কোনোটিকেই মুসলমান শাসকদের সদর দপ্তর হিসেবে বা বিখ্যাত স্থান হিসেবে ধরা যায় না। ঢাকা প্রায় একশো বছর ধরে নবাবের বাসস্থান ছিল, কিন্তু ফরিদপুর ছাড়া আশেপাশের যে কোনো জেলার তুলনায় এখানে মুসলমানদের সংখ্যা কম। মালদা এবং মুর্শিদাবাদে পুরানো রাজধানী রয়েছে, যেগুলি প্রায় সাড়ে চার শতাব্দী ধরে মুসলমান শাসনের কেন্দ্র ছিল তবুও সেখানে মুসলমানদের জনসংখ্যা দিনাজপুর, রাজশাহী এবং নদীয়ার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় কম।

তৃতীয় একটি তত্ত্ব যা সাধারণত ভারতে ইসলামাইজেশন ব্যাখ্যা করার জন্য অগ্রসর হয় তা হলো যাকে বলা হয় পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রলোভনের ধর্ম। এই মত হলো প্রাক-আধুনিক যুগের ভারতীয়রা শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে কিছু অধর্মীয় অনুগ্রহ— কর থেকে ত্রাণ, আমলাতন্ত্রে পদোন্নতি এবং আরও অনেক কিছু পাওয়ার জন্য ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এই তত্ত্ব সর্বদা পশ্চিমি-প্রশিক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ বিজ্ঞানীদের সমর্থন পেয়েছে যারা যে কোনও ধর্মকে কিছু অধর্মীয় সংস্থার নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল হিসেবে দেখেন, বিশেষত সামাজিক উন্নতি বা প্রতিপত্তির জন্য একটি অনুমতি আকাঙ্ক্ষা। ভারতের ইতিহাসে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে এই তত্ত্বকে সমর্থন করে বলে মনে হচ্ছে। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ইবন বতুতা রিপোর্ট করেছেন যে ভারতীয়রা নিজেদেরকে নতুন ধর্মান্তরিত হিসেবে খিলজি সুলতানদের কাছে উপস্থাপন করেছিল, পরিবর্তে খিলজিরা হিন্দুদের পদমর্যাদা অনুসারে সম্মান দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আদমশুমারি অনুসারে, উচ্চ ভারতের অনেক জমিদার পরিবার রাজস্ব পরিশোধ না করার জন্য বা পৈতৃক জমি

পরিবারে রাখার জন্য কারাদণ্ড থেকে বাঁচতে নিজেদের মুসলমান ঘোষণা করেছিল। এই তত্ত্বে মুসলমান শাসকদের নিযুক্ত সেই গোষ্ঠীগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরিত না হলেও অনেক বেশি ইসলামি সংস্কৃতিকে আত্মীকরণ করেছিল। গাঙ্গেয় সমভূমির কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়রা, মহারাষ্ট্রের পারসনিস এবং সিন্ধুর আমিলরা সকলেই সরকারি কেরানি ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে গিয়ে ইসলামিক সংস্কৃতির চর্চা করেছিল, এর সম্পর্কে শ্রী আজিজ আহমদ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর 'পাশ্চাত্যায়নের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।' বন্দি সৈন্য বা ক্রীতদাসদের জড়ো করা সম্ভবত এই প্রক্রিয়ায় আরেক মাত্রা তৈরি করেছে। তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের স্থানীয় বাড়ির সঙ্গে কোনো স্থায়ী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক না থাকায়, আশ্চর্য নয় যে এই লোকেরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সাংস্কৃতিক কক্ষপথে পড়েছিল।

যদিও এই থিসিস ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থলে তুলনামূলক কম ইসলামিকরণের ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে, তবে এটা রাজনৈতিক শক্তির প্রান্তে সংঘটিত ব্যাপক ধর্মান্তরকে ব্যাখ্যা করতে পারে না যেমন— পঞ্জাব বা বাঙ্গলায়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, তরবারির প্রভাবের মতো, সেই পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্রগুলি থেকে দূরে সরে যাওয়ায় বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেত। আমাদের যা দরকার তা হলো এমন কিছু তত্ত্ব যা শুধুমাত্র মুসলমান শক্তির কেন্দ্রস্থলে নয়, তার সমগ্র পরিধির মধ্যে ব্যাপক ইসলামীকরণের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং শুধুমাত্র শহুরে অভিজাতদের মধ্যে নয়, লক্ষ লক্ষ কৃষক চাষীদের মধ্যেও।

এই লক্ষ্যে একটি চতুর্থ তত্ত্ব, যাকে 'সামাজিক মুক্তির ধর্ম' থিসিস বলা যায়। ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক এবং ইতিহাসবিদদের দ্বারা সৃষ্ট, অনেক পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের সমর্থনপুষ্ট, বিশদভাবে বর্ণিত এবং দক্ষিণ এশিয়ার অগণিত সাংবাদিক এবং ইতিহাসবিদগণ, বিশেষ করে মুসলমানদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, এই তত্ত্ব দীর্ঘদিন ধরে উপমহাদেশে ইসলামীকরণের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ব্যাখ্যা। এই তত্ত্ব হিন্দু বর্ণপ্রথাকে অনুমান করে যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তনীয় এবং তার নিজস্ব নীচু স্তরের বিরুদ্ধে ভয়ংকরভাবে বৈষম্যমূলক ছিল। বলা হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা নিপীড়নকারী, অত্যাচারী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুর চাপে নির্যাতিত হচ্ছিল। তারপর যখন ইসলাম ভারতীয় উপমহাদেশে 'আগমন' করে, সুফি শেখদের দ্বারা প্রচারিত তত্ত্বের বেশিরভাগ সংস্করণ সামাজিক সাম্যের মুক্তির বার্তা বহন করে, তখন এই একই নিপীড়িত জাতিগুলি ব্রাহ্মণ্য নিপীড়নের জোয়াল থেকে বাঁচতে চেয়েছিল এবং সচেতন ছিল। সামাজিক সমতা এ পর্যন্ত তাদের অস্বীকৃত থেকেছে, তাই তারা ইসলামে 'ধর্মান্তরিত' হয়েছে।

এটা দেখা যায় যে ইসলামের অন্তর্নিহিত ন্যায়বিচার এবং হিন্দু সমাজের অন্তর্নিহিত দুষ্টতা বলে যা উপলব্ধি করে, তা পাশাপাশি রেখে 'সামাজিক মুক্তির ধর্ম' তত্ত্ব ধর্মান্তরের প্রণোদনাগুলোকে চিহ্নিত করে, তবে স্পষ্টত এটা মুসলমান দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রশংসনীয়। তবে সমস্যা হলো, তত্ত্বের সমর্থনে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া, এটা গভীরভাবে অযৌক্তিক। প্রথমত, অতীতের মানুষদের কাছে বর্তমান সময়ের মূল্যবোধ আরোপ করে এটা ইতিহাসকে পিছনে ঠেলে দেয়। ধরে নেওয়া হয় যে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের আগে ভারতের নিম্ন বর্ণের লোকেরা জ্যাঁ-জ্যাক রুসো বা থমাস জেফারসনের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং তাকে আত্মস্থ করেছিল, দমনমূলক ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের দ্বারা অস্বীকৃত মানবজাতির সমস্ত মৌলিক সমতার কিছু সহজাত ধারণা তাদের ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা করার সময়, প্রাক-আধুনিক মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা তাদের ধর্মের সামাজিক সাম্যের আদর্শের বিপরীতে হিন্দু অসমতার উপর জোর দেননি, বরং তারা জোর দিয়েছিলেন হিন্দু বহুদেবতার বিপরীতে ইসলামিক একেশ্বরবাদের উপর। অর্থাৎ এই দুই সভ্যতার তুলনা করার জন্য তাদের রেফারেন্স ছিল ধর্মতাত্ত্বিক, সামাজিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম সামাজিক সাম্যকে (ধর্মীয় সাম্যের বিপরীতে) উৎসাহিত করে এমন ধারণা একটা সাম্প্রতিক ধারণা বলে মনে হয়, যা কেবলমাত্র আলোকায়নের সময় থেকে বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকার থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান সংস্কারকদের মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, যদি ভারতীয়রা মানবজাতির মৌলিক সমতায় বিশ্বাস করত এবং যদি ইসলামকে তাদের কাছে সামাজিক সাম্যের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়— যদিও উভয় প্রস্তাবই মিথ্যা বলে মনে হয়— প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে ইসলামীকরণের ফলে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে তাদের অবস্থা উন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীতে, বেশিরভাগ ধর্মান্তরিত মুসলমান পূর্বে হিন্দু সমাজে তাদের যে অবস্থান ছিল ধর্মান্তরণের পর সেই অবস্থানেই থেকে গেছে। এটা বাঙ্গলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। জেমস ওয়াইজ যেমন ১৮৮৩ সালে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, 'ভারতের অন্যান্য অংশে চাকর বা নীচু কাজ করানো হয় সমাজচ্যুত হিন্দুদের দিয়ে; কিন্তু বাঙ্গলায় যে কোনো বিদ্বেষমূলক বা আক্রমণাত্মক পেশা মুসলমানদের উপর বর্তায়। মুসলমান গ্রামের কাছে বেলদার (মেথর এবং মৃতদেহ অপসারণকারী) যা হিন্দু গ্রামের কাছে ভুঁইমালি তাই। এটা অসম্ভব নয় যে তার পূর্বপুরুষেরা এই হীন বর্ণের লোক ছিলেন।'

অবশেষে, তলোয়ার এবং পৃষ্ঠপোষকতা তত্ত্বের মতো, সামাজিক মুক্তির ধর্ম তত্ত্বও ভূগোলের তথ্য দ্বারা খণ্ডন করা হয়। ১৮৭২ সালে, যখন প্রথমতম নির্ভরযোগ্য আদমশুমারি নেওয়া হয়েছিল, তখন পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং বালুচিস্তানে মুসলমানদের সর্বাধিক ঘনত্ব পাওয়া যায়। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে যা লক্ষণীয় তা হলো যে তারা শুধুমাত্র মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে ছিল তা নয় বরং ইসলামের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের সময়ে তাদের জাতিগোষ্ঠী এখনও হিন্দু বা বৌদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একত্রিত হয়নি। বাঙ্গলায় মুসলমান ধর্মান্তরিতরা মূলত রাজবংশী, পোদ, চণ্ডাল, কুচ এবং অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠী থেকে আকৃষ্ট হয়েছিল যাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির খুব অল্প আদানপ্রদান হয়েছিল; পঞ্জাবে বিভিন্ন জাঠ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য ছিল।

১৮৭২ সালে প্রদেশের প্রথম সরকারি আদমশুমারিতে তারা বিস্মিত হয়েছিল যখন চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, পাবনা এবং রাজশাহী জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা ৭০ শতাংশ বা তার বেশি এবং বগুড়ায় ৮০ শতাংশের বেশি। ১৮৯৪ সালে লিখতে গিয়ে, প্রদেশের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সরকারি কর্মকর্তা জেমস ওয়াইজ লিখেছেন যে '১৮৭২ সালের আদমশুমারি দ্বারা প্রকাশিত সবচেয়ে মজার তথ্য হলো নিম্ন বাঙ্গলায় বসবাসকারী মুসলমানদের বিশাল সংখ্যা পুরানো রাজধানীগুলোর আশেপাশে নয়, কিন্তু বদ্বীপের পলল সমভূমি অঞ্চলে ছিল।' তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে 'বর্তমানকালে নিম্ন ও পূর্ববঙ্গে মুসলমান ধর্মের প্রসারের ইতিহাস এমন এক বিশাল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার জন্য সতর্কতা সানুপুঙ্খ সমীক্ষার প্রয়োজন।'

বিষয়টা অবশ্যই পরীক্ষা করা হয়েছে। ১৮৭২ সালের আদমশুমারি একটি উত্তপ্ত বিতর্ককে ছোঁয় যা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাকি অংশ এবং বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। আদমশুমারি প্রতিবেদনের সংকলক হেনরি বেভারলি নিজেই এর গোড়ার কারসাজি খারিজ করেছিলেন। মুসলমান আধিপত্যের প্রাচীন কেন্দ্রগুলি থেকে অনেক দূরের অঞ্চলে মুসলমান জনসাধারণের আবির্ভাবের আপাত অসঙ্গতি লক্ষ্য করে, বেভারলি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে 'বাঙ্গলায় মহমেডান অস্তিত্ব দেশে মুঘল বংশের প্রবর্তনের জন্য ততটা হয়নি যতটা হয়েছিল আদি বাসিন্দারা যাদের পক্ষে বর্ণ ব্যবস্থার কঠোর ব্যবস্থা হিন্দুধর্মকে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তাদের ধর্মান্তরণের জন্য'। সংক্ষেপে, তিনি অভিবাসন তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে পরিবর্তে 'সামাজিক মুক্তি' তত্ত্বের একটি প্রাথমিক সংস্করণের রূপরেখা রচনা করেছিলেন। অতঃপর বাঙ্গলায় ইসলামীকরণের কারণ হিসেবে ব্রিটিশ চিন্তাভাবনায় এই তত্ত্ব প্রাধান্য পাবে এবং শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ মুসলমানও এতে সমর্থন করবে।

ময়মনসিংহ জেলার শ্রদ্ধেয় মুসলমান ভদ্রলোক, আবু এ. গজনভি, তার জেলার কালেক্টরের কাছে বেভারলির এই যুক্তির বিরোধিতা করে একটি প্রতিবেদনে দাখিল করেন যে গণধর্মান্তর ঘটেছে। গজনভি পরিবর্তে প্রস্তাব করেছিলেন যে 'অধিকাংশ আধুনিক মহমেডানরা চণ্ডাল এবং কৈবর্তর বংশধর নয় বরং তারা বিদেশি আগন্তুকদের বংশধর যদিও অনেক ক্ষেত্রে এটা কমবেশি মাত্রার হতে পারে'। তার যুক্তির পক্ষে, গজনভি তুর্কি বিজয়ের আগে আরব অভিবাসন, বিদেশিদের জন্য সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি অনুদান (পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রলোভন বা তাকিয়া), মুঘল বিজয়ের পর আফগানদের 'প্রতিটি গ্রামে' বিচ্ছুরণ, বহুবিবাহ ও বিধবা পুনর্বিবাহ প্রথার কারণে মুসলমানদের বৃহত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, তাদের দীর্ঘায়ু (এও এক ধরনের প্রলোভন), এবং মুসলমানদের মধ্যে বর্ণপ্রথা বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্যের অনুপস্থিতি। যদিও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে 'কিছু' ধর্মান্তরিত হয়েছে, জগনভি জোর দিয়েছিলেন যে তারা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছিলেন না। 'কেন আমরা শুধুমাত্র নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরের কথা বলব?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কেন বিভিন্ন জেলার মুসলমান রাজপুত দেওয়ানদের এবং বিশেষ করে ময়মনসিংয়ের কথা ভুলে যাব। ...একইভাবে, সিলেটের মজুমদার, ফরিদপুরের রাজা সাহেব, বিক্রমপুরের গাঙ্গুলী এবং আরও অনেকে আছেন।

গজনভি এখানে ইসলামিকরণের অভিবাসন তত্ত্বের রূপরেখা দিচ্ছিলেন, যা সমগ্র ভারতে আশরাফ শ্রেণীর পছন্দ হয়েছিল। যে পরিমাণে স্থানীয় ধর্মান্তর ঘটেছিল, গজনভি যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা ঘৃণ্য নিম্ন বর্ণ থেকে নয়, হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণী থেকে এসেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, দাবি করা হয়েছিল যে মুঘল শাসনা আমলে বাঙ্গলার ভূমধ্যস্থ অভিজাত ও এমনকী পুরোহিত বর্ণের কিছু সদস্য ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। আকবরের একজন সেনাপতির কাছে পরাজিত খড়্গপুরের (মেদিনীপুর জেলার) রাজারা তাদের পারিবারিক সম্পত্তি ধরে রাখার শর্ত হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়, উত্তর বিহারের দ্বারভাঙার পারসোনির রাজা পুরদিল সিং মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর প্রায়শ্চিত্ত করতে মুসলমান হয়েছিলেন, ত্রিপুরার সরাইল পরগনা এবং ময়মনসিংহের হয়বতনগর ও জঙ্গলবাড়ির মুসলমান দেওয়ান পরিবারগুলি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিল; এবং দ্বারভাঙার বাকৌলির পাঠানরা নারহানের রাজার পরিবার থেকে জন্মেছিল। এই দৃষ্টান্তগুলি, তবে, মোট মুসলমান জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশের জন্য ঠিক হতে পারে লক্ষ লক্ষ মুসমান কৃষকের উপস্থিতির ব্যাখ্যা করতে পারে না আদমশুমারির পরিসংখ্যানে যার রেকর্ড করা হয়েছে।

গজনভির ও আশরাফের মুখপাত্রদের অভিবাসন তত্ত্বকে খারিজ করে দিয়ে ওয়াইজ শুরু করেছিলেন। 'মুসলমানদের ইতিহাসে', তিনি উল্লেখ করেন, 'উত্তর ভারত থেকে কোনো বড়ো মুসলমান অভিবাসনের কোনো উল্লেখ নেই এবং আমরা জানি যে আকবরের রাজত্বকালে বাঙ্গলার জলবায়ু মুঘল আক্রমণকারীদের পক্ষে এতটাই প্রতিকূল বলে বিবেচিত হয়েছিল যে সেখানে পাঠানোর আদেশকে নির্বাসনের শাস্তি হিসেবে গণ্য করা হতো।' ওয়াইজ তারপরে জাতিগত বাঙ্গালিরা কীভাবে এবং কেন মুসলমান হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। প্রথমত, তিনি তরবারির ধর্ম তত্ত্ব পুনরুল্লেখ করেছিলেন, 'উৎসাহী সৈন্যরা যারা ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে, বাঙ্গলার ভীরু জাতিদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছিল, তরবারির মাধ্যমে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছিল এবং অনুপ্রবেশ করেছিল। পূর্বসীমান্তের ঘন বন, সিলহাটের গ্রামে ইসলাম রোপণ করেছে'। চট্টগ্রাম অঞ্চল আরব বণিকদের ঔপনিবেশিক ছিল বলেও তিনি স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে, আরবরা, তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, চট্টগ্রাম উপকূলে ব্যাপক বাণিজ্য চালিয়েছিল, যেখানে তারা 'মানুষের মধ্যে তাদের ধর্মীয় ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে।' তদ্ব্যতীত, তিনি পরামর্শ দেন, পূর্ব বাঙ্গলার গ্রাম থেকে বন্দি ক্রীতদাসরা (তরবারির ধর্ম) হয়তো মুসলমান জনসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে, যেহেতু হতাশ ও দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের দাস হিসেবে মুসলমানদের কাছে বিক্রি করতে নিপীড়িত হতো। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে হিন্দুরা 'হত্যা বা ব্যভিচারের শাস্তি (তরবারির ধর্ম) থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হিসেবে ধর্মান্তরিত হতে পারে, কারণ এই পদক্ষেপ উভয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বলে বিবেচিত হতো। এই সমস্তই ছিল তরবারির ধর্মের উদাহরণ। □

সরকারি কর্মীদের প্রতি উদাসীন সরকার

বিশ্বপ্রিয় দাস

আমলাদের মন জয় করতে গত ১২ মে কলকাতার টাউন হলে অনেক মনমোহিনী কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বললেন। তিনি রাজ্যের আমলাদের রাজ্য সরকারের আসল মুখ বলে উল্লেখ করলেন। উপেক্ষিত রয়ে গেলেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মী। যাদের কোনো কিছু বলার অধিকার নেই। যাদের চাওয়াটাকে কখনও বলা হয় ঘেউ ঘেউ, কখনও-বা মিউ মিউ। এমনকী বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার ক্ষমতায় এসেই বলে দিয়েছেন মহার্ঘ্য ভাতা কর্মীদের অধিকারের মধ্যে পড়ে না। এই দিন যখন আমাদের জন্য একের পর এক ঘোষণা হচ্ছে, তখন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ফেউ ফেউ করে তাকিয়ে শুধুই শুনছিলেন সেই কথা। টাউন হলে যখন ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকা আমলাদের বারে বারে কোভিডকালে লড়াই করার জন্য ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে, প্রকৃত রাস্তায় নেমে যে সব সরকারি কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, হাসপাতালের কর্মী থেকে করোনা যোদ্ধা চিকিৎসক থেকে নার্স যুদ্ধ করেছেন— তাঁদের ভাগ্যে আজও জুটল না সামান্যতম বাহবা সূচক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আবেগ ঘন ধন্যবাদ জ্ঞাপক কয়েকটি কথা। এমনকী যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন এই যুদ্ধে, সেই সব যোদ্ধাদের ন্যূনতম সম্মানটুকু কি দিয়েছেন সুপ্রিমো?

রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছেন, বিধান সভা নির্বাচনে ও উপনির্বাচনে আমলাদের সক্রিয় ভাবে জেতাবার ভূমিকাকে রাজ্যের সরকার পুরস্কৃত করল। একতরফা ভাবে বর্তমান শাসক দলকে ক্ষমতায় আনার ব্যাপারে যে সহযোগিতা এই আমলা শ্রেণী করেছিল, সেটাকেই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান পরোক্ষে স্বীকৃতি দিলেন।

রাজ্যের সরকারের কাছে কয়েক লক্ষ সরকারি কর্মী কী পরিচয়ে আছেন, সেটাই জানতে চান সরকারি কর্মীদের একাংশ। বঞ্চনা আর বঞ্চনায় তাঁরা একেবারে শেষ। তাঁদের প্রশ্ন, অভাবের যে দোহাই সরকার দেয়, আমলাদের জন্য দরাজহস্ত হবার সময়ে তা কি একবারের জন্যও মনে পড়ল না?

এদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি শিক্ষকদের একটি মাত্র পদোন্নতি হয় প্রধান শিক্ষকের। সব পদন্নতি বন্ধ। ৭ বছরের বেশি সময় এই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না সরকার। রাজ্যের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাচ্ছেন টিআইসি-রা। এর জন্য তাঁরা আলাদা ইনক্রিমেন্ট বা কোনো অ্যালাউন্স পান না। একেবারে স্বেচ্ছায় প্রধান শিক্ষকের সব কাজগুলিই করতে হয়। অথচ মেলে না কিছুই। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষকরা চাইছেন যত শীঘ্র সম্ভব রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষকরা পান না কোনো রকমের রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো সুবিধা। তাঁদের না আছে ইএল, না আছে এলটিসি, না আছে হেলথ স্কিন, না আছে পদোন্নতির সুযোগ। এভাবেই নামেই সরকারি স্নেহচ্ছায়ায় আছেন তাঁরা। এখানে অনাবশ্যক ভাবে একটি কথা আনতে হচ্ছে। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের সারা জীবনের সঞ্চয় থাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডে। শুনলে অবাক হবেন যে, সেটি জমা হয় সংসদের চেয়ারম্যানের নামে। কারোর ব্যক্তিগত নামে ওভাবে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা পড়ে কী করে? প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নির্ভর করে সংসদের চেয়ারম্যানের দয়ার ওপর। যদি সংসদের চেয়ারম্যান কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান, তিনি আবার কাউন্সিলর। অন্যদিকে দেড় দশক ধরে তিনিই রয়েছেন এই পদে। সব সংসদের চেয়ারম্যান পরিবর্তন হলেও, তিনি হন না। এক সময়ের অতি বাম, এখন অতি তৃণমূল এই চেয়ারম্যান সংসদে আসেন তাঁর মর্জি মাফিক। ফলে বুঝতে পারছেন কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদের অফিসিয়াল কাজকর্ম কেমন হচ্ছে। আবার অন্য পদে থাকেন, তাহলে তাঁর অধীন থাকা শিক্ষককুলের যে কী অবস্থা হতে পারে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন অনেক শিক্ষকই।

এখন পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মীদের মাত্র ৩ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়। অন্যান্য রাজ্যে মহার্ঘ ভাতার হার অনেক বেশি। সম্প্রতি হাইকোর্ট রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডি-এ অবিলম্বে মিটিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকার কি এই নির্দেশ মানবে? □

বাংলাদেশে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে হিন্দু বিতাড়নের পরিকল্পনা

রঞ্জন কুমার দে

বাংলাদেশে ধারাবাহিক তথাকথিত ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ এবং কট্টর মোল্লাবাদের স্পষ্ট ছবি ক্রমশ নখ-দাঁত বের করেছে, একাত্তরের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এখন হিন্দুদের প্রতি হুমকি স্বরূপ। বাংলাদেশের ভারত বিরোধী মোল্লাবাদী শক্তি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সাংবিধানিক কাঠামোর যে কোনো সিদ্ধান্তকে ধর্মের রঙে সাজিয়ে বিভিন্ন রকম মুখরোচক গুজব তৈরি করে নিজেদের মতো করে পরিবেশন করে। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতের কর্ণাটকে বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পোশাক পরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই মোল্লাবাদীরা অপপ্রচার চালায় যে ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের হিজাবে প্রতিবন্ধকতা লাগানো হয়েছে। কাশ্মীরে ৩৭০ এবং ৩৫এ-র বিলুপ্তিকরণেও এই ধর্মব্যবসায়ীরা রাজপথে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ছড়িয়ে

ধর্ম অবমাননার রোজনামচা কি এভাবেই চলতে থাকবে? অপরাধীরা কী মানসিক ভারসাম্যহীন পাগল সেজে বারবার পার পেয়ে যাবে? এর শেষ কোথায়?

আসছিল।

সম্প্রতি লতা সমাদ্দার নামের এক শিক্ষিকা কপালে টিপ পরায় সরকারি এক পুলিশ কর্মীর বিষোদ্গার ও অশালীন আচরণ দেশটির অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আঘাত আনে। ঘটনাটি তীব্রতর প্রতিবাদের আকারে রূপ নেয় যখন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্যা তথা বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সুবর্ণা মোস্তফা সংসদে দাঁড়িয়ে সরকারি একজন পুলিশ কর্মকর্তার প্রাপ্তবয়স্কা এক নারীর টিপ পরার জন্য কটু মন্তব্য ও প্রাণঘাতী হামলার তীব্র প্রতিবাদ করেন। পীড়িতা তেজগাঁও কলেজের প্রভাষক ড. লতা সমাদ্দার জানান সেদিন কলেজে যাওয়ার পথে ধর্মীয় টুপি পরিহিত লম্বা দাড়িওয়ালা এক পুলিশকর্মী 'টিপ পরছোস ক্যান?' বলে গালি দেয় এবং তাঁর পায়ের উপর দিয়ে বাইক চালিয়ে নিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন যে, ওই পুলিশকর্মী এমন কিছু অশ্লীল বাক্যের প্রয়োগ করেছিল যেগুলো নিজের স্বামীর সঙ্গে শেয়ার করাও লজ্জাজনক।

শিক্ষামন্ত্রী দিপু মণি ঘটনাটির নিন্দা করতে গিয়ে লেখেন, 'আমি মানুষ, আমি মুসলমান, আমি বাঙ্গালি, আমি নারী'। তিনি তাঁর টিপ পরিহিত বেশ কয়েকটি ছবিও সেই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। 'লাল টিপ,

লাল সূর্য' লিখে দেশটির প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ঠিকই প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু সিংহভাগ মানসিকভাবে বিকৃত মোল্লাবাদীরা ট্রোলের বিন্দুমাত্র জায়গা ছাড়েনি। দেশটির প্রথম সারির মিডিয়া একাত্তর টিভি, প্রথম আলো ঘটনাটির ধারাবাহিক প্রতিবেদন ছাপিয়ে আসছিল। প্রখ্যাত নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন বিদ্রূপের সুরে লেখেন, 'মুসলমান পুরুষেরা তো কল্পনার ঈশ্বরের উদ্দেশে, কল্পনার বেহেশতের লোভে মাথা ঠুকতে ঠুকতে কালো দাগ বানিয়ে ফেলেছে কপালে। ওটাই ওদের কালো টিপ'। টিপ বিতর্কের মতো একটা নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি হবে এটা অনেক আগে থেকেই আন্দাজ করা যাচ্ছিল, যখন ঢাকার বায়তুল মোকারাম মসজিদের সামনে বাংলাদেশের তালিবানপন্থী মোল্লাবাদীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিল হিন্দু মেয়েদের কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, ছেলেদের ধুতি পরে বের হতে দেওয়া যাবে না।

দুর্ভাগ্যবশত ৭১-এর অসাম্প্রদায়িক সরকার এই সামাজিক কীটদের আইনের আওতায় আনা দূরে থাক, উলটো এখন ধর্মীয় মোল্লাবাদীদের কাছে জিম্মি হয়ে যেন এক নির্মম অসহায়। এই একই জায়গা বায়তুল মোকারামে দাঁড়িয়ে সেদিন মোল্লাবাদীদের দল ঘোষণা দিয়েছিল, বাংলাদেশের জাতির জনক তথা দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যদি তাঁর ভাস্কর্য নির্মাণ দোলাইপাড়ে করা হয়, তাহলে তৌহিদী জনতা সেটা তুলে বুড়িগঙ্গার নদীতে নিক্ষেপ করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেখানে মোল্লাবাদীদের হুংকারে নিজ পিতার প্রতি ভাস্কর্য বানানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন না সেখানে আগামীদিনে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজ কীভাবে কপালে সিঁদুর বা টিপ পরে, শাঁখ বাজিয়ে পূজার্চনা করবে! প্রকৃতপক্ষে টিপ কোনো নির্দিষ্ট ধর্মাচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং বাঙ্গালি নারীদের স্বমহিমা ও আত্মমর্যাদার লিগেসি। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে টিপের ভূমিকা কী, এ বিষয়ে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির ইসলাম বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুখতার আহমেদ জানান, টিপ পরা নিষিদ্ধ--- এরকম কোনো মন্তব্য কোরান-হাদিসে নেই।

টিপ বিতর্কের ঘোর দেশে কাটতে না কাটতেই ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে আবার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করা হয়। ২১ মার্চ বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় চন্দ্র মণ্ডল এবং ৬ এপ্রিল আরেক সহকারি প্রধান শিক্ষিকা আমোদিনী পালকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে উভয়কে মিথ্যে বানোয়াট পরিকল্পনার শিকারের সুস্পষ্ট প্রমাণ ফুটে উঠেছে। মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক সহকারী শিক্ষক হৃদয় মণ্ডল সেদিন শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের প্রশ্নোত্তরে পড়াচ্ছিলেন বিজ্ঞান আর ধর্ম দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। একটি প্রমাণ নির্ভর, আরেকটি বিশ্বাস নির্ভর। শিক্ষক ও ছাত্রের এই ধারাবাহিক কথোপকথন পূর্ব পরিকল্পনামাফিক ভিডিয়োগ্রাফি চলছিল— সৌজন্যে অবশ্যই কিছু জেহাদি ছাত্র। কয়েক মিনিটের এই পর্বে শিক্ষক কোনোভাবেই ধর্মকে ছোটো করার চেষ্টা করেননি, বরং বিজ্ঞানের ভূমিকাটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

তিনি এটাও স্বীকার করেছিলেন— মাটি, গাছপালা ইত্যাদি তো মানুষের তৈরি নয়, নিশ্চয় কোনো সুপার পাওয়ারের। কিন্তু আফশোস যে, সেই ধর্ম অবমাননার অপবাদে তাঁকে নিজ কর্মস্থলে দলবদ্ধ মোল্লাবাদী আক্রোশ থেকে বাঁচাতে পুলিশকে উপস্থিত হতে হয় এবং ১৯ দিনের প্রাথমিক কারাবাসও ভোগ করতে হয় তাঁকে। প্রকৃতপক্ষে পুরো ঘটনাটিই ছিল ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং একঘরে করে রাখার অপচেষ্টা। মামলার বাদী এই বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী মোহাম্মদ আসাদ এখন অনুশোচনা করে বলছেন, 'স্যার একজন খুব ভালো মানুষ ও শিক্ষক। আমার সঙ্গে ঘটনার ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ কোনো আলোচনা করেনি। শুধু মামলার বাদী হতে সদর থানায় ডাকা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, আসাদ এখন মনোকষ্টে ভুগছেন এবং শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলও অপরাধী ছাত্রদের নিজগুণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, এই ঘটনার ঠিক ১৫ দিন পর আবার ধর্ম অবমাননার বলি হয়েছিলেন নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার দাউল বারাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহপ্রধান শিক্ষিকা আমোদিনী পাল। অভিযোগ, তিনি নাকি হিজাব পরে আসায় ছাত্রীদের পিটুনি দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ ১৫০-২০০ উন্মাদ ধর্মান্ধ বিদ্যালয়ে হামলা চালায়। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে সেদিন ৬ এপ্রিল শিক্ষিকা আমোদিনী পাল এবং শরীরচর্চা বিষয়ক শিক্ষক বদিউল আলম নির্ধারিত স্কুল ইউনিফর্ম না পরে আসায় শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিয়েছিলেন, অথচ শুধু আমোদিনী পালকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং করা হয় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ। এর আগেও নারায়ণগঞ্জের একজন এমপি স্কুলে ঢুকে এক হিন্দু শিক্ষককে কান ধরে উঠবোস করিয়েছিলেন। সিলেটের গোপালগঞ্জের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ক্লাস চলাকালীন ছাত্রীদের অক্সিজেনের গুরুত্ব বুঝতে বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার জন্য মাস্ক ও নিকাব খুলতে বলায় তাঁর উপর চরম ধর্ম অবমাননার অভিযোগ আনা হয় এবং রাজপথে শাস্তির জন্য আওয়াজ উঠে। বেচারা সেই শিক্ষক এখনো পলাতক, আত্মগোপনে রয়েছে।

চট্টগ্রামের মিরসরাই জোরারগঞ্জ বৌদ্ধ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষার কান্তি বড়ুয়ার বিরুদ্ধে হিজাবের নিন্দা করার অভিযোগ উঠলে উপজেলা প্রশাসন স্কুলের ৭০টি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ তদন্ত করে তেমন কিছু পায়নি। স্কুলের বিজ্ঞান বইয়ে ডারউইনের মতবাদে পড়ানো হচ্ছে ডারউইন নিজেও তাঁর মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। কুরান শরিফ ও বাইবেলে মানুষের জন্মকাহিনি বিষয়ক বর্ণনা ও তথ্যও ডারউইনের মতবাদের সমার্থক নয়। এই ঘটনাগুলো যখন ঘটছে তখন একই সঙ্গে বাগেরহাট জেলার সন্ধ্যারতি চলাকালীন ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মঠ, মন্দির ঘরবাড়ি পুড়ছে। এই ধর্ম অবমাননার রোজনামচা কি এভাবেই চলতে থাকবে? অপরাধীরা কী মানসিক ভারসাম্যহীন পাগল সেজে বারবার পার পেয়ে যাবে? এর শেষ কোথায়? শিক্ষিত মানুষেরা মুখ খুলছেন না কেন? □

আর্যদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃত (?)-তে ঋক্‌বেদ লিখিত হওয়ায় আরও দুটি প্রশ্ন উঠে আসে, যদি প্রথমদিকে শত শত বছর ধরে তা ঋষিদের স্মৃতিতে 'শ্রুতি'-র আধারে থাকে তাহলে আর্যগণ কি শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপি লেখার কাজটি করেছিলেন?

কেমন ছিল হরপ্পার ধর্ম ও ভাষা

দেবাশিস চৌধুরী

ইতিহাস কালের পথ ধরে নিজস্ব ছন্দে হেঁটে যায়। তার এই হেঁটে চলার পথটি একজনের চোখে একরৈখিক তো অপরজনের চোখে বৃত্তাকার। একরৈখিক হোক বা বৃত্তাকার, কাল বা সময়ের আরম্ভটি হয় একটি বিন্দু থেকে আর এই বিন্দুটিকে সৃষ্টির প্রারম্ভ রূপে ধরা হয়। সৃষ্টির চলা একরৈখিক পথে শুরু হলে সহজেই তার আদি ও অন্ত বিন্দুটি শনাক্ত করা যায়। কারণ 'অনন্ত-সরলরেখা' ধারণায় সৃষ্টির বিনাশ কখনোই ঘটবে না, বাস্তবে যা অসম্ভব। জুদাই বা আব্রাহামীয় (ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম) মতের শুরুটা হয় কোনো একজন 'ঈশ্বর-পুত্র'-এর মাধ্যমে একরৈখিক পথে। অপরদিকে সৃষ্টির চলা বৃত্তাকার পথে শুরু হলে সৃষ্টির আদি ও অন্ত বিন্দুটি শনাক্ত করা যায় না। কারণ '০' ডিগ্রির সঙ্গে '৩৬০' ডিগ্রির কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সৃষ্টি তা মানুষের হোক বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, অন্ত থেকেই পুনরায় সৃষ্টির পুনরারম্ভ, আর এখান থেকেই আসছে জন্মান্তর বাদ— মৃত্যুর পরও মরণ নেই। এই কারণে কালের একরৈখিক পথ চলায় বিশ্বাসী আব্রাহামীয় মতে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা হয় না। বলা হয় জন্ম একটাই। অপরদিকে কালের বৃত্তাকার পথ চলায় বিশ্বাসী মানুষেরা মনে করেন এই বিশ্বাস বা ধর্ম কোনো একজন মানুষ অথবা একজন ঈশ্বর-পুত্র বা অবতারের মতাদর্শানুযায়ী গড়ে ওঠেনি। যুগ যুগ

ধরে সাধনার দ্বারা ঋষি-পরম্পরায় এই তত্ত্ব উপলব্ধ হয়েছে। তাই একে সনাতনী ধারা বা সনাতন ধর্ম বলা হয়। সনাতন ধর্মের এই ঋদ্ধ-সাধকরাই হলেন ঋষি আর তাঁদের সাধনভূমির নাম জম্বুদ্বীপ, অধুনা ভারতবর্ষ। এই ঋষিদের সাধন-পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে সাকার ও নিরাকার, দুটি পদ্ধতিই স্বীকৃত ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, একমাত্র হরপ্পাসভ্যতা ছাড়া সমসাময়িক সুমের-সভ্যতা-সহ অন্য কোনো সভ্যতাতেই এই নিরাকার সাধন চর্চার কোনো নিদর্শন আজ অবধি পাওয়া যায়নি। নিদর্শনটি হচ্ছে হরপ্পা থেকে উদ্ধার হওয়া একটি আবক্ষ পুরুষ মূর্তি। ছবিটি আমরা সবাই দেখেছি, কিন্তু তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা না করে পাশ্চাত্য মতানুযায়ী 'টোটেম' বলেই ধরে নিয়েছি। মূর্তিটির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুটি অর্ধনিমীলিত চোখের নাসাগ্রে স্থির-দৃষ্টি। মূর্তিটি যদি কোনো গোষ্ঠীপতির, পুরোহিত বা রাজার হতো তবে চোখের ওই বিশেষ দৃষ্টির বদলে সাধারণ উন্মীলিত দৃষ্টি থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। চোখের এই বিশেষ ভঙ্গিমা একমাত্র যোগ সাধনরত অবস্থায় একজন ঋষিরই থাকে। অপরদিকে হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত পাঁচ-পশুসংবলিত

ত্রিমুখবিশিষ্ট যোগীমূর্তির সিলমোহর জন মার্শালের মতে 'আদি শিব' বা পশুপতি শিব হলেও তা আদতে সাকার সাধনারই প্রতীক। হরপ্পাতে মন্দিরের অস্তিত্ব না থাকায় এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে তৎকালীন সমাজে আড়ম্বরপূর্ণ সাকার-আরাধনার বদলে গৃহস্থের বাসস্থানেই সাকারের ঘরোয়া পুজো হতো।

এখন প্রশ্ন, এই ঋষিগণ কোনো এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর অংশ নাকি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঋদ্ধ-সাধকদের ঋষি বলা হয়? পশ্চিমি পণ্ডিতগণের আর্য-অভিবাসন তত্ত্ব অনুযায়ী, সুদূর অতীতে এশিয়া- মাইনরের স্তেপ অঞ্চল থেকে একদল পশুপালক ছড়িয়ে পড়েছিলেন এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে। এই পশুপালক জনগোষ্ঠী হচ্ছে 'আর্য'। এই আর্যরা প্রথমে ইরানে চলে এসে বসতি স্থাপন করে ও কৃষিকার্য শুরু করে, অর্থাৎ যাযাবর থেকে কৃষিজীবী হয়ে ওঠে। পরে এই আর্য জনগোষ্ঠীর একটা অংশ ইরান থেকে ভারতে চলে আসেন। এই তত্ত্বের সমর্থনে তাঁরা এশিয়া মাইনরে আবিষ্কৃত ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বোঘাজ-কোই শিলালিপির উল্লেখ করেন, যাতে হিটাইট ও মিত্তানি রাজবংশের মধ্যে একটি বৈবাহিক চুক্তির কথা বলা হয়েছে এবং সাক্ষী হিসেবে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বড়ো কোনো অভিবাসন হলে পুরুষদের সঙ্গে মহিলা ও শিশুদেরও আসার কথা, কিন্তু আধুনিক ডিএনএ গবেষণায় যে সামান্য 'আর্য-জিন' (R1a1)-এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তাতে শুধু 'পুরুষ-চিহ্ন (Y) রয়েছে। তাছাড়া বড়ো অভিবাসন হলে আর্যদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্ঘাত বা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল। এর উত্তরে পশ্চিমি পণ্ডিতরা 'স্থানীয় অধিবাসী' হিসেবে হরপ্পা-সভ্যতার অধিবাসীদের চিহ্নিত করেন এবং এই তত্ত্বের প্রমাণস্বরূপ ঋক্‌বেদে উল্লিখিত দেবরাজ ইন্দ্র, যাঁকে পুরন্দর বা দুর্গ ধ্বংসকারী রূপে দেখা হয়েছে, তাঁকে হরপ্পা-সভ্যতার ধ্বংসকারী রূপে মান্যতা দেন যা 'অন্তিম নিধন তত্ত্ব' নামে পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে ডিএনএ টেস্টের ফল বলছে হরপ্পা-সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত অস্থিগুলিতে ক্ষত চিহ্নই নেই। এছাড়া অধুনা রাখিগড়ি অঞ্চলে প্রাপ্ত অস্থির উপর করা ডিএনএ টেস্টে 'আর্য-জিন' (R1a1) পাওয়াও যায়নি।

পঞ্চাশ বছর আগে অবধি ধারণা ছিল সিন্ধু-অববাহিকায় মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা নিয়েই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতা। কিন্তু একে একে মেহরগড়, লোথাল, কালিবাঙ্গান, ধোলাভিরা, গানেরিওয়ালা, বনয়ারি, চানহুদারো, ভিরওয়ানা, রাখিগরি সামনে আসার পর গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা, পঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান হয়ে আফগানিস্তান অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে এখন একসঙ্গে 'হরপ্পা-সভ্যতা বলা হচ্ছে। হরপ্পা-সভ্যতার স্বর্ণযুগ ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অবধি হলেও ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-তে হরিয়ানার ভিরওয়ানা ও বালুচিস্তানের মেহরগড়-১ম পর্যায় থেকে শুরু হয়ে ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-তে হরপ্পা-৫ম পর্যায়ে শেষ হয়। এদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্য-অভিবাসন হয়েছিল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ঋক্‌বেদের রচয়িতা আর্যগণ সরস্বতী নদী দেখলেন কী করে? বর্তমান গবেষকদের মতে হরিয়ানার রাখিগড়ির কাছে এখনকার ঘাঘর-হরকা নদীটিই হচ্ছে ঋক্‌বেদের সরস্বতী নদী। ঘাঘর-হরকা এখন ক্ষীণকায়া হলেও এই নদীই যে একসময় বেগবতী ছিল তার প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। যেমন— যমুনা ও শতদ্রু নদীর মিলিত হওয়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে এই নদীর সঙ্গে এবং নদীখাতের নীচে অগভীর জলস্তরে। তাঁদের মতে নদীটি ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। তাহলে ঋগবেদের রচনাকাল কি ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে? এছাড়া এই ঋক্‌বেদে আর্যদের আদি বাসভূমি ইরানের বা এশিয়া-মাইনরের কোনো উল্লেখ নেই অর্থাৎ ঋক্‌বেদ রচনাকালে আদি বাসভূমির স্মৃতি তাঁদের মন থেকে মুছে গিয়েছিল, এই স্মৃতি-বিলুপ্তি ঘটতে যদি ৩০০ বছরও লেগে থাকে তাহলে ঋক্‌বেদের রচনাকাল ২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দতে গিয়ে দাঁড়ায়, যা কিনা হরপ্পা-সভ্যতার স্বর্ণ যুগ!

আবার আর্যদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃত (?)-তে ঋক্‌বেদ লিখিত হওয়ায় আরও দুটি প্রশ্ন উঠে আসে, যদি প্রথমদিকে শত শত বছর ধরে তা ঋষিদের স্মৃতিতে 'শ্রুতি'-র আধারে থাকে তাহলে আর্যগণ কি শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপি লেখার কাজটি করেছিলেন? মহাভারত রচনাকালে যেমনটি ঋষি ব্যাসদেব গণেশকে দিয়ে করিয়েছিলেন? দ্বিতীয়ত, সেই সময়ে হরপ্পা-অধিবাসীদের নিজস্ব ভাষা যদি সংস্কৃত বা এর কাছাকাছি কোনো ভাষা না হয় তবে তাদের ভাষাটি কেমন ছিল? রাতারাতি কোনো ভাষার অবলুপ্তি তো সম্ভব নয়। 'হরপ্পা-সভ্যতা' থেকে প্রাপ্ত 'লেখ'-গুলির পাঠোদ্ধার করা গেলে হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর মিলত। দুর্ভাগ্যবশত আজ অবধি কোনো ভাষাবিদ তা করতে পারেননি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের জনক স্যার ইউলিয়াম জোন্সের মতে সংস্কৃত ভাষা গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার চেয়ে বেশি উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত এবং এই তিনটি ভাষার মধ্যে বিশেষ মিল থাকার জন্য এদের উৎপত্তি একই আদি ভাষা থেকে তা ধরা যেতেই পারে। অর্থাৎ তাঁর মতে একটি আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জন্ম। নৃতাত্ত্বিক ডেভিড ডব্লিউ অ্যান্টনির মতে এই প্রি-এনাতোলিয়ান ভাষার জন্ম ৪২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, এনাতোলিয়া বলতে এশিয়া মাইনরকে বোঝায়। প্রি-এনাতোলিয়ান ভাষাকে আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হিসেবে ধরে নিলে এঁদের মতে ভাষার জন্মই হয়েছে ৪২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। মজার ঘটনা, ওই সময়টা হচ্ছে রহপ্পা-সভ্যতার মেহেরগড় পর্বের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পর্যায় (৫৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। অর্থাৎ এই তত্ত্বানুযায়ী জন্ম (৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) থেকে ২৮০০ বছর অবধি মেহেরগড়ের অধিবাসীরা মৌন ছিলেন এবং তাঁরা কমপক্ষে আরও ২২০০ বছর, মোট ৫০০০ বছর, ভাষা শেখার জন্য আর্যদের আসার অপেক্ষায় ছিলেন! এই প্রসঙ্গে পুরাতত্ত্ববিদ কলিন রেনফ্রিউ ১৯৮৭ সালে Archaeology and Language : The Puzzle of the Indo-European Origins নামে একটি বই প্রকাশ করেন। বইটিতে তাঁর 'এনাতোলিয়ান হাইপোথিসিস'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উৎপত্তি এনাতোলিয়া (এশিয়া মাইনর)-তে আজ থেকে আনুমানিক ৯০০০ বছর আগে হয়েছিল এবং কৃষিকর্মের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়েছিল। লক্ষ্য করুন, এই সময়েই হরপ্পা-সভ্যতার ভিরওয়ানা পর্বের ও মেহেরগড় পর্বের প্রথম পর্যায়ের শুরু (৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি না, এখানে আদি-ইন্দো- ইউরোপীয় ভাষা থেকে যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাটি বিকশিত হয়েছিল তা ছিল সংস্কৃতের আদি রূপ। এখন বলা যেতেই পারে, এটা একটা 'হাইপোথিসিস', 'থিয়োরি' তো নয়। ঠিকই, কারণ তাঁর এই বইটি প্রকাশ হবার পর পাশ্চাত্যের ভাষাবিদরা পালটা যুক্তি দেখিয়ে যা বলেছিলেন তার স্থূল মানে দাঁড়ায়, একজন পুরাতত্ত্ববিদের কাছ থেকে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনতে চান না, তাই আজও এটি 'অনুমান' থেকে 'তত্ত্ব' হয়ে উঠতে পারেনি।

দেশের মধ্যে মোল্লাবাদী রাজনৈতিক দলগুলি সংগঠন বিস্তারে সক্রিয়

উগ্র মুসলমান মোল্লাবাদী রাজনৈতিক দল এসডিপিআই দেশের মধ্যে কীভাবে গোপনে সংগঠন বিস্তার করে চলেছে, তার দলের নেতার মুখে শোনা কাহিনির উপলব্ধি সকলের সামনে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে এই পত্রের অবতারণা।

গত ১ মে ব্যক্তিগত কাজে পণ্ডিচেরী গিয়েছিলাম। ভেলোর থেকে আমরা ৩ জন এজেন্সির মাধ্যমে একটি গাড়ি ভাড়া করে সকালে রওনা ছিয়েছিলাম। গাড়ির চালকের নাম সাদ্দাম হোসেন। ২৫ বছর বয়সের তরতাজা যুবক। ভেলোর শহরের বাসিন্দা। জীবনে নাকি মন্দির দর্শন করেনি এবং আর সেরকম কোনো বাসনাও নেই। মাধ্যমিক পাশ। আরও পড়াশোনা না করার কারণ জানতে চাওয়ায় উত্তরে জানালো এর বেশি নাকি পড়ার দরকার হয় না। ওর বিশ্বাস বেশি লেখা পড়া জানা লোকেরা নাকি সমাজের শত্রু। কথাবার্তার মধ্যে একটা উগ্রপন্থার ছোঁয়া। স্বাভাবিকভাবেই ওর নাম সাদ্দাম হোসেন শুনেই এক কুখ্যাত ইরাকি প্রেসিডেন্টের চরম অত্যাচারের কাহিনি সামনে ভেসে ওঠে। সেই অত্যাচারীর কাহিনি সামনে রেখে ওই নাম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করায় ছেলেটি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। জোরের সঙ্গে দাবি করল সাদ্দাম হোসেন খুব ভালো লোক ছিল। সাদ্দাম মুসলমান সমাজের নয়নের মণি। শত্রু আমেরিকা তাকে অন্যায় ভাবে খতম করেছে। তার বদলা নেবার দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব তার চোখে-মুখে।

সাদ্দামের মৃত্যুর পর হাজার হাজার সাদ্দাম হোসেনের জন্ম হয়েছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। সাদ্দাম হোসেনের অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করার জন্যই নাকি তার জন্ম। সেজন্য বাবা তার নাম রেখেছে সাদ্দাম। তার কথায় মনে হলো পুরো পরিবারই এক জেহাদি ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন। ছেলেটি মাধ্যমিক পাশ হলেও রাজনৈতিক ভাবে বেশ সচেতন দেখলাম। কথাবার্তার ফাঁকে হঠাৎ দেখি সে একটি ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে দিল। দেখলাম ওই গাড়িচালক ভেলোর শহরের SDPI (Socialist Democratic party of India) পার্টির সভাপতি। বুঝলাম শিকড় অনেক গভীরে! তার কাছেই শুনলাম এটি মুসলমানদের উন্নয়নে সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক দল এবং এর শাখা সংগঠন হলো PFI (Popular Front of India)। তার ভাষায় এটির উদ্দেশ্য হলো আরএসএস-কে খতম করা। কিন্তু খতম করার পরের সুপ্ত বাসনাটি আমার কাছে গোপন রাখলো। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো দুটি জাতীয়তাবাদী সংগঠনকে দেশ থেকে নির্মূল করা। এরাই হলো তাদের কাছে একমাত্র শত্রু। শেষ করার জন্য প্রয়োজনে সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এদের মনে কী ধরনের উগ্রপন্থার বিষ বপন করা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। ওই ছেলেটিই অকপটে বলছে, সারা দেশে সর্বত্র তাদের শিকড় অনেক গভীরে এবং দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নীরবে নিভৃতে কাজ করছে। ভাবুন তো কী ভয়ংকর পরিকল্পনা! এটাই নাকি দলের একমাত্র আদর্শ। ছেলেটি জানাল, কেরলে নাকি সবচেয়ে শক্তিশালী ওদের দল। পশ্চিমবঙ্গের অনেক খবর রাখে দেখলাম, বিশেষ করে মুসলমানদের বিষয়ে বেশ সচেতন। অবাক হবেন ছেলেটির দাবি পশ্চিমবঙ্গে হুগলির ব্যান্ডেলে ওদের শক্ত ঘাঁটি। ছেলেটি দলের কাজে ব্যান্ডেলে এসেছিল বলতে দ্বিধা করলো না। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে নীরবে বিষবৃক্ষের বীজ বুনে চলেছে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে ছেলেটি পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে গেছে দলের কাজে, তাও উল্লেখ করল। কথায় বোঝা গেল পশ্চিমবঙ্গের দিকে দলের বিশেষ নজর। ওর দাবি বর্তমানে দলটি দক্ষিণ ভারতে মূলত শক্তিশালী। ছেলেটি আবার সিএএ, এনআরসি-র বিরুদ্ধে বিষোদগার করে মোদী ও শাহের মুণ্ডুপাত করে চলেছে। কী ধরনের মগজ ধোলাই হয়েছে, যুবকের কাছে তার প্রমাণ পেলাম এবং এদের কার্যকলাপ যে আগামীদিনে ভয়ংকর হবে তার আভাসও পেলাম। এই ভাবে তার মুখ থেকে দলের ক্রিয়াকলাপ শুনতে শুনতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম।

মোল্লাবাদী মুসলমান সংগঠনগুলো দেশের মধ্যে কীভাবে জাল বিস্তার করে চলেছে তার একটি নমুনা ওই গাড়িচালকের কাছে পেলাম। বিরোধী দলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিজেপি ও আরএসএস-কে একই বন্ধনীতে রেখে তার দাবি, এরাও দুটি সংগঠন গড়েছে, একটি রাজনৈতিক দল এসডিপিআই এবং অন্যটি হলো যুব সংগঠন পিএফআই যা কিনা আরএসএস-এর সমতুল্য। দেশের মধ্যে আর কত দেশবিরোধী সংগঠনের গোপন কাজ চলছে, ভাবলে মন শিউরে উঠে। দেশবাসী ও প্রশাসন সচেতন না হলে আগামীদিনে দেশের সমূহ বিপদ। সেজন্য শক্তিশালী হিন্দু সমাজই হলো একমাত্র সমাধান। সেই কাজটিই সঙ্ঘ নীরবে করে চলেছে। ওদের দেশবিরোধী কাজ যে সঙ্ঘ রুখতে পারে তা তাদের জানা। আমার মনে হয় এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ হিমশৈলের একটি চূড়া মাত্র।

—আনন্দ মোহন দাস,
উত্তরপাড়া, হুগলি।

বিধর্মীদের বিষয়ে অজ্ঞতা হিন্দুদের সর্বনাশের মূল কারণ

না, হিন্দুরা কখনই শিখবে না। তারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কোনও শিক্ষাই নেবে না স্থির করেছে। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন কাশিম তার শ্বশুর আরবের শাসক হজ্জাজের নির্দেশে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে শিক্ষা দেওয়া আর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিল। যুদ্ধে রাজা দাহিরকে পরাজিত

ফঃ ৩

এবং হত্যা করে মহম্মদ বিন কাশিম শুরু করেছিল ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। ৬০০০ হিন্দু নর-নারীকে হত্যা করে ৩০০০০ হিন্দু নর-নারীকে বন্দি করে আরবের দাসবাজারে পাঠানো হয়েছিল ক্রীতদাস-দাসী হিসেবে বিক্রি করার জন্য। রাজা দাহিরের দুই কন্যাকে আরবের শাসক হজ্জাজের কাছে তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য ভেট হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। হাজার হাজার হিন্দু স্ত্রী-পুরুষকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারপর প্রায় ৫০০ শো বছর আর বড়ো কোনওরকম মুসলমান আক্রমণ ঘটেনি। হিন্দুরাও সব ভুলে গিয়ে ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেনি। অত্যাচার, হত্যা, ধর্মান্তরকরণ, মন্দির ধ্বংস, অপবিত্র করা ক্লোজড চ্যাপ্টারে পরিণত হয়েছিল।

এরপর ১০০০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুদ মূর্তিমান বিভীষিকার মতো ভারতে এসেছিল। তার সেনারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা আর বাল্যের লীলাভূমি বৃন্দাবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিল। হিন্দুর রক্তে মধুরা বৃন্দাবনের মাটি কর্দমাক্ত হয়েছিল, হাজার কয়েক হিন্দুকে হত্যা করে, হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল মামুদের সেনারা। তারপর গজনির দাসবাজারে নিয়ে গিয়ে তাদের ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করে চলেছি আমাদের কিছু করার দরকার নেই। আমাদের কাজ শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা তাহলেই ঈশ্বর আমাদের সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। যদিও বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। সুলতান মামুদ যখন সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেছিল তখন কয়েক হাজার হিন্দু সন্ন্যাসীও সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল বাবা সোমনাথ সুলতান মামুদ ও তার সেনাদের ধ্বংস করে দিয়ে আশ্রিত ভক্তদের রক্ষা করবেন। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটেছিল? সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে ৫০০০০ হাজার হিন্দু স্ত্রী-পুরুষকে বন্দি করে গজনির দাসবাজারে পাঠানো হয়েছিল বিক্রি করার জন্য। এটাই শেষ নয়। এরপর মহম্মদ ঘোরি, তৈমুর লং, বাবর, আহমেদ শাহ আবদালি, নাদির শাহ বিভিন্ন বিধর্মী আক্রমণকারীরা ভারত আক্রমণ করে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে তবুও হিন্দুরা অতীতের ঘটনাবলী থেকে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি। ফলশ্রুতি পাঁচশো বছর মুসলমান শাসকদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, মন্দির ভাঙা, দেব-দেবীর মূর্তি অপবিত্র করা ধর্মান্তরকরণ, হিন্দু মহিলাদের যৌনদাসীতে পরিণত করা অবাধে চলছিল। অথচ এসব বিষয়ে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন হিন্দু ধর্মগুরুদের কোনও চিন্তা ভাবনা ছিল না। তাঁরা প্রচার করে চলেছিলেন 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' যা কিছু ঘটছে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটছে। এই সমস্ত কারণে হিন্দুরা কখনই নিজেদের সংগঠিত করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্রিয় হয়নি। বর্তমানে মুসলমানরা আর ভারতের শাসক নয়। তবুও হিন্দুরা এখনও মুসলমানদের সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে। প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলিই মুসলমান ভোটের লালসায় তাদের তৈল মর্দন করে চলেছে। ১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে হিন্দুদের ওপর যে নারকীয় বর্বরোচিত অত্যাচার হয়েছিল। হিন্দু ও শিখ মহিলাদের ধর্ষিতা, নির্যাতিতা এবং পরে ধর্মান্তরিতা অথবা নিহত হতে হয়েছিল। বর্তমান প্রজন্ম এসব কিছু জানে না, তাদের জানতে দেওয়া হয়নি।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
বড়োবাজার, চন্দননগর।

জ্ঞানবাপি মসজিদ

সালটা ১৯৯৫। আমরা দেরাদুন লক্ষ্ণৌ হয়ে এসেছিলাম বারাণসীতে। ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা যাকে বলে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। ওখানেই রাতের খাওয়ার পরে হঠাৎ আমার মায়ের ইচ্ছা হয় ওই রাতেই মন্দির দর্শন করতে যাবেন। মা সঙ্গী হিসেবে আমার স্ত্রী দীপু ও আমার ব্যাংকের তৎকালীন জেনারেটর চালক দিলীপ পালকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। ওদের উপর ভরসা না হওয়ায় আমার বাবা আমাকে ওদের সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আমরা যখন মন্দিরে পৌঁছাই তখন শিবের শয়ন আরতি চলছিল। মন্দিরে নিযুক্ত সরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা সমবেত ভাবে শয়ন আরতি দেখছিলেন। আমরাও জীবনে প্রথম ওই রাতে শিবের শয়ন আরতি দেখে নিজেকে ধন্য বলে মনে করি। তারপর আমরা ৪ জন নন্দীর (বৃষ) কাছে যাই, তখন একজন দশাসই চেহারার সরকারি নিরাপত্তা অফিসার উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইধার কিঁউ?' আমি বলি, 'লজ্জ্যা দেখনে কে লিয়ে আয়া হুঁ।' ওই অফিসার তখন গলার স্বর নরম করে বলে, 'আপ ক্যায়া করতে হো।' আমি বলি, 'ব্যাংকে চাকরি করি।' ওই অফিসার খুব চঞ্চল হয়ে বলেন, 'আরে ভাই না। আপ আউর ক্যায়া করতে হো?' ওর কথা বুঝতে পেরে বলি, 'আরএসএস'। ওই অফিসার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমাদের নিয়ে আসেন, যাকে আমরা বলি জ্ঞানবাপি মসজিদ ঠিক তার পিছনের দিকে। ওখানে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। অফিসার ক্যামেরা আছে কি না জিজ্ঞাসা করলে মাথাই নেড়ে জানাই, না। বলেন, 'আচ্ছা হ্যায়। আপ তসবির লে সকতে থে।'

ফ্ল্যাড লাইটের আলোতে যা দেখলাম তা দেখে চোখ ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম হলো। যেটা সামনে থেকে ধাঁচাটা দেখে মসজিদ মনে হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক পিছনের অংশটা দেখলেই মন্দির বলে মনে হয়। পিছনের দেওয়াল জুড়ে আছে বেলপাতা ও পদ্মফুলের কাজ। যা কখনই কোনো মসজিদে থাকার কথা নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জলে অনুভব করতে লাগলাম মুসলমান আমলে কত চোখের জল ফেলেছে হিন্দু সমাজ। কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে হিন্দু সমাজকে। মুসলমান শাসন, তারপর আড়াইশো বছর ইংরেজদের শাসন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর আসল সত্য আলোর মুখ দেখতে পারবে দেশ আশা নিয়ে আছে। যদি নেহরু চাইতো, তারাও করতে পারতো। ৬০ বছর কংগ্রেস শাসন করেছে দেশ। কিন্তু তাদের কোনো সদিচ্ছা ছিল না। বাকি আঞ্চলিক দলগুলিও সংখ্যালঘু ভোটের লোভে সত্য ও ইতিহাসকে অস্বীকার করে দেশকে পিছিয়ে দিতে পিছপা হয়নি।

—শ্যামল হাতি,
চাঁদমারী রোড, হাওড়া-৯।

নতুন দিগন্তে যাত্রা শুরু মেয়েদের

সেজুঁতি চট্টোপাধ্যায়

প্রথম ভারতীয় মহিলা ফাইটার পাইলট হিসেবে নজির গড়তে চলেছেন বারাণসীর মেয়ে শিবাঙ্গী সিং। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শিবাঙ্গী এই সেদিনও মিগ-২১ বাইসন ওড়াতেন। দেশের নিরাপত্তা গ্যাজেটে রাফালের অন্তর্ভুক্তির পরেই তার উড়ানের দায়িত্ব পান শিবাঙ্গী। এ এক অনন্য সম্মান। অনন্য দৃষ্টান্ত। এভাবেই দেশের মেয়েদের উপর দেশের রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করছে মোদী সরকার।

যে দেশের সমাজ মেয়েদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে পারে, সে দেশের অগ্রগতি অনিবার্য। দেশের সার্বিক উন্নতিতে মেয়েদেরও যে অনেকাংশে অগ্রণী ভূমিকা থাকে তা এতদিনে প্রমাণিত। মেয়েরা যদি একবার এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। এযুগের মেয়েরা স্বাধীনতা, শিল্প, সম্মান ও শক্তির অধিকারী হয়ে উঠছেন। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁরা প্রত্যয়ী। এদেশের এগিয়ে চলার পথ আরও সুগম করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভারত সরকার। তাই মেয়েদের সুরক্ষা থেকে শুরু করে তাঁদের ক্ষমতায়ন—প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ভারত সরকার। ফলে সুরক্ষিত সমাজে আরও ভালো দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবে ভারতের মেয়েরা। নতুন ভারতের স্বপ্ন শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষমতায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁদের নেতৃত্বে উন্নয়ন-যাত্রার পথ প্রশস্ত করা। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় আইনের পরিবর্তন এবং নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারেন। তাই আজকের ভারতীয় মেয়েরা দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার সঙ্গে কাজ করে সাফল্যের নজির তৈরি করেছেন।

ভারতীয় বিমান বাহিনীতে ফাইটার পাইলট কমান্ডো অথবা কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের নিয়োগ অথবা সৈনিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তির মতো নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে আজ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। মহিলা উদ্যোক্তাদের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য মুদ্রা যোজনায় বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নারী নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি তৎপরতায় তৈরি হয়েছে বিশেষ কর্মসূচি— মিশন শক্তি। এই কর্মসূচির আওতায় দেশের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ক্ষেত্রের নিয়োগে এতদিন যে লিঙ্গ বৈষম্যের অভিযোগ উঠত তাতে ইতি টানতে চলেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। এখন থেকে নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও মেয়েদের যোগদান থাকবে প্রায় সমান।

ভারতীয় বিমান বাহিনী ২০২২ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত ১৫ জন মহিলা ফাইটারকে কমিশন দিয়েছে। নিরাপত্তা ক্ষেত্র ছাড়াও যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় মেয়েদের নিযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। একইভাবে নৌবাহিনীর বিমান ও হেলিকপ্টার পরিবহণযোগ্য সামুদ্রিক জাহাজে যুদ্ধের ভূমিকায় মহিলাদের মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ১০,৪৯৩ জন মহিলা অফিসার রয়েছেন। ৪৭৩৪ জন আর্মি নার্সিং সার্ভিসে কর্মরত। ২০২১ সালে ৬০ জন মহিলা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে কমিশন লাভ করেছেন। ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে নৌবাহিনীতে ১৭০ জন মহিলা প্রার্থী অফিসার হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মিলিটারি পুলিশ কর্পসের অন্যান্য পদে মহিলাদের নিয়োগ বিধান চালু হয়েছিল ২০১৯ সালে। এই প্রকল্পের অধীনে পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। ২০১৯-২০ সালের শূন্যপদের জন্য ইতিমধ্যে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বেশি করে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এখন থেকে সৈনিক স্কুলের দরজাও খোলা রয়েছে মেয়েদের জন্য। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ৩২০ জন ছাত্রীকে ৩৩টি সৈনিক স্কুলে ষষ্ঠশ্রেণীতে ভর্তি নেওয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রীদের বহু পদ খালি রয়েছে। ২০২১ ও ২০২২ সালের এনডিএ পরীক্ষায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৯১ জন মেয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ব্যাচে নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

সরকারের এই পদক্ষেপে উৎসাহিত হয়ে মেয়েরাও দেশ রক্ষার নানা ভূমিকায় ময়দানে নেমে পড়েছেন। স্যালুট তাঁদের। □

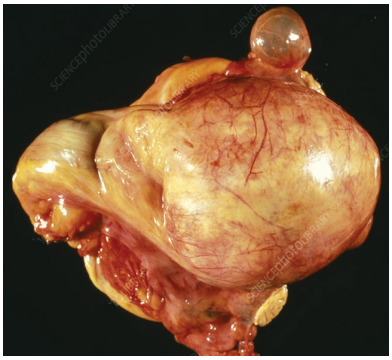

জরায়ুতে টিউমার মানেই ক্যানসার নয়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

জরায়ুতে টিউমার বলতে সাধারণত ফাইব্রয়েড ইউটেরাসকে বোঝায়। এই টিউমার প্রায় ৯৮-৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই ফাইব্রয়েড ধরনের হয়, তাই 'নন-ফাইব্রয়েড' বা 'বিনাইন'। হাতেগোনা কিছু ক্ষেত্রেই টিউমার 'ম্যালিগন্যান্ট' বা 'ক্যানসারাস' হয়। যেমন লিও মায়ো সারকোমা। ১ শতাংশেরও কম মহিলার হয়।

কেন হয় : ফাইব্রয়েড ইউটেরাস একাধিক কারণে হয়। মূলত ইউটেরাসে ইস্ট্রোজেন রিসেপটরের অসামঞ্জস্যের জন্যই টিউমারগুলোর উৎপত্তি বেশি হয়। এদের বলা হয় ইস্ট্রোজেন-ডিপেন্ডেন্ট টিউমার। এতে ইউটেরাসের মাসল লেয়ার অর্থাৎ মায়োমেট্রিয়ামের মাসল সেলের 'হাইপারট্রপি' এবং হাইপারপ্লেশিয়া' হয়। কোষগুলি আকৃতি, সংখ্যায় বেড়ে টিউমার তৈরি করে। সিংহভাগই 'নন-ক্যানসারাস'। ২০ বছরের পর থেকে যে কারও ফাইব্রয়েড হতে পারে। তবে ৩৫-এর পর বেশি দেখা যায়।

সমস্যা কী কী : মহিলারা চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হন তিনটি প্রধান অভিযোগ নিয়ে। এক, মেনোরেজিয়া অর্থাৎ ঋতুকালীন অবস্থায় 'হেভি ফ্লো'। আর দুই, পিরিয়ডসের সময় পেটে ব্যথা। তৃতীয়, বন্ধ্যাত্বের সমস্যা। মহিলাদের বন্ধ্যাত্বের ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী জরায়ুতে টিউমার। যদিও সেই ৪০ শতাংশের মধ্যে ৯-১০ শতাংশ ক্ষেত্রেই ফাইব্রয়েডের জন্য বন্ধ্যাত্ব হয়।

জরায়ুর টিউমার বড়ো হতে থাকলে মূত্রথলির উপর চাপ পড়ে 'ইউরিনারি' সমস্যা হতে পারে। রেকটামের উপরও চাপ পড়তে পারে। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা হয়। কিডনিতে হাইড্রোনেফ্রেসিসও হতে পারে।

মেনোরেজিয়ার জন্য মহিলারা প্রায়ই 'ক্রনিক' অ্যানিমিয়ায় ভোগেন। এমনিতেই এদেশে, মহিলাদের রক্তে হিমোগ্লাবিনের মাত্রা কম থাকে, তাই 'ব্লাড লস'-এ অ্যানিমিয়া আরও বাড়ে।

বন্ধ্যাত্বের কারণ : ৯-১০ শতাংশ ক্ষেত্রে ফাইব্রয়েডের জন্যই বন্ধ্যাত্ব হয়। আবার কখনও কখনও মহিলারা ফাইব্রয়েড সত্ত্বেও অন্তঃসত্ত্বা হন। গর্ভধারণের পর চেক আপের জন্য ডাক্তারের কাছে এলেন, তখন ধরা পড়ল। 'প্রেগন্যান্সি'তে ফাইব্রয়েডে দুটি সমস্যা হতে পারে। এক, গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর হতে পারে প্রিটার্ম লেবার অর্থাৎ সময়ের আগেই লেবার পেন শুরু হওয়া। কিন্তু সাধারণত গর্ভাবস্থায় ফাইব্রয়েডের চিকিৎসা হয় না। প্রেগন্যান্সি চলাকালীন টিউমারের সার্জারি করা হয় না। সম্ভব হলে ডেলিভারির সময় ফাইব্রয়েড সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে যদি 'প্রেগন্যান্সি'র আগে টিউমার ধরা পড়ে, আর যদি তা ছোটো হয় এবং দেখা যায় তাতে বন্ধ্যাত্বের সম্ভাবনা নেই, তাহলে ওটি হয় না।

কিন্তু টিউমারের জন্যই যে বন্ধ্যাত্ব, তা ধরা যাবে কী করে? সেক্ষেত্রে রোগীকে 'ইনফার্টিলিটি' সংক্রান্ত অন্য সমস্ত কারণ পরীক্ষা করানো হয়। অন্য কোনও কারণ না থাকলে ধরে নিতে হবে, ফ্রাইব্রয়েড আছে, যা বন্ধ্যাত্বের কারণ হিসেবে পরিচিত। যেমন সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড। তবে ইনট্রামিউরাল ফাইব্রয়েড যদি থাকে, আর যদি তার আকার ৪.৫ সেন্টিমিটারের থেকে বড়ো হয়, তার জন্যও বন্ধ্যাত্ব হয়।

চিকিৎসা কী : আজকাল বিভিন্ন ওষুধ এসেছে। দাবি হচ্ছে যে, এর সেবনে ফাইব্রয়েডের আকার ছোটো করা সম্ভব। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া খুব একটা সক্রিয় হয় না। টিউমার নিশ্চিহ্ন হয় না। কিছুটা ছোটো হলেও ওষুধ বন্ধের পর যে কে সেই, তাই ওষুধ স্থায়ী সমাধান নয়। চিকিৎসার দ্বিতীয় বিকল্প ইউট্রাইন-আর্টারি ইমবোলাইজেশন। এতে ইউট্রাইন-আর্টারিকে ব্লক করে দেওয়া হয়। তবে সব রোগীর ক্ষেত্রে এটা করা যায় না।

সুতরাং অস্ত্রোপচারই প্রধান চিকিৎসা। যদিও সব ফাইব্রয়েডের সার্জারি করা হয় না। ৪.৫ সেন্টিমিটারের ছোটো হলে ওটি হয় না। কিন্তু যে কোনও আকারেরই টিউমারের জন্য যদি মেনোরেজিয়া, পেটে ব্যথা বা বন্ধ্যাত্বের উপসর্গ থাকলে অস্ত্রোপচার হয়। উপসর্গ না থাকলে, ৫ সেন্টিমিটারের কম হলে ওটি হয় না।

জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক : জরায়ুতে টিউমার, পিসিওডি-র মতো কোনও 'লাইফস্টাইল ডিজঅর্ডার' নয়। তাই জীবনযাত্রা পরিবর্তনে রোগের নিরাময়ে বিরাট কোনও পরিবর্তন আসার কথা নয়।

সার্জারির রকমফের : 'আমার ইউটেরাসে টিউমার রয়েছে, তাহলে কি ইউটেরাস বাদ দিতে হবে? উত্তর : বহুক্ষেত্রেই না। টিউমারে ওটি-রও শ্রেণীবিভাগ আছে। বেশিরভাগেরই 'মায়েমেক্টমি' সার্জারি হয়, যা হলো শুধু টিউমারটিকে সরিয়ে দেওয়া। অল্প বয়েসি, যাদের সন্তান এখনও হয়নি বা সন্তান চান, তাদের ক্ষেত্রে এই সার্জারি ভালো বিকল্প। মায়োমেক্টমি চিরাচরিত পদ্ধতি অর্থাৎ পেট কেটেও যেমন করা হয়, তেমনই মাইক্রোসার্জারিও করা যায়।

দ্বিতীয়, 'সার্জিক্যাল' বিকল্প 'অ্যাবডোমিনাল হিসটেকটমি'। অর্থাৎ টিউমার-সহ পুরো ইউটেরাসটাকেই বাদ দেওয়া। যাঁদের ৪০-এর বেশি বয়স, পরিবার সম্পূর্ণ (আর সন্তান চাইছেন না) বা অতিরিক্ত বড়ো ফাইব্রয়েড— তাঁদের করা হয়। কারণ মায়োমেক্টমি করিয়ে ইউটেরাসকে শরীরে রেখে দিলে ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে আবার টিউমার হতে পারে। হিসটেকটমিও পেট কেটে বা মাইক্রোসার্জারি করা যায়। অনেক সময় অপারেশনের পর নানা কমপ্লিকেশন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ। □

খেলতে খেলতে ভুলের ফাঁদে

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

আপনার টিনএজার ছেলেটি পাবজিতে মজে নেই তো? পাবজি এখন সারা পৃথিবীতে সব থেকে জনপ্রিয় গেমিং অ্যাপ। ভারতেও পাবজির চাহিদা আকাশছোঁয়া। কিন্তু পাবজি কতটা মারাত্মক হতে পারে তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই মিলেছে।

প্রমাণ নং এক। ঘটনাস্থল ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর। উনিশ বছরের রাজেশ পাবজিতে ডুবে থাকত সারাদিন। এই খেলায় এক ধাপ থেকে পরের ধাপে পৌঁছতে হলে গাঁটের কড়ি খরচ করতে হয়। পাবজির নেশা এমনই যে বেশিরভাগ টিনএজার টাকা দিয়ে দেয়। রাজেশ প্রথমে বাবা-মা'র কাছে টাকা চেয়েছিল। তাঁরা টাকা না দেওয়ায় সে বাইক বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে। চলতে থাকে খেলা। সারাদিন নতুন-নতুন উত্তেজনায় বুঁদ হয়ে থাকে রাজেশ। খেলতেই খেলতেই চলে এল পরের ধাপ। সর্বনাশ, এবার কী হবে! ভেবেচিন্তে অভিনব একটা উপায় বের করল রাজেশ। নিজেই নিজের হাত-পা বেঁধে ছবি তুলে সেই ছবি পাঠিয়ে দিল বাবা-মা'র কাছে। চিঠিতে লিখল, আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নীচে দেওয়া ঠিকানায় চার লক্ষ টাকা না পাঠালে আমাকে ওরা খুন করবে।

প্রমাণ নং দুই। রাজস্থানের এই ঘটনাটি আরও মারাত্মক। অনলাইন গেমিং অ্যাপে টোকেন কেনার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ধার করেছিল এক কিশোর। ধার শোধ করতে না পেরে সে তার বারো বছরের কাজিনকে কিডন্যাপ করে। পুলিশ তদন্ত করতে নেমে অবাক। এরকমও হয়? উত্তর হলো, হয়। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে ভারতের কুড়ি বছরের কমবয়েসি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ মোবাইলে গেম খেলার জন্য খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেবার জন্য প্রস্তুত। ৬৫ শতাংশ মানে ঠিক কত? সংখ্যাটা জানলে নিঃসন্দেহে সবাই চমকে উঠবেন— ৫৫ কোটি! বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন দেশের বহু ছেলে-মেয়ে গেমিং অ্যাপের খাঁই মেটানোর জন্য নিজের বাড়িতেই চুরি করা শুরু করেছে। হয়তো সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন আমাদেরই পরিচিত কারোর ছেলে বা মেয়ে গেমিংয়ের উত্তেজনায় নিজের বাড়িতে কিছু না পেয়ে পরের বাড়িতেও ঢুকে পড়বে চুরি করার জন্য।

ক্ষতি কোন পথে

(১) গেমিংয়ের নেশা একবার ধরলে শরীরের ওজন মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়। রিপোর্ট অনুযায়ী, কোভিড-পরবর্তী ভারতে বাচ্চাদের ওজন ৩-৪ কেজি পর্যন্ত বেড়ে গেছে। সারাদিন বাড়িতে বসে গেমিং এর প্রধান কারণ বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

(২) দীর্ঘসময় মোবাইল স্ক্রিনে চোখ রাখলে চোখের ক্ষতি হয়।

(৩) সারাদিন গেমিং করে রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারছে না বাচ্চারা। বাড়ছে স্লিপিং ডিজঅর্ডার জনিত অসুখ।

(৪) বাচ্চাদের খিদে আগের থেকে কমে গেছে। এর জন্যেও মাত্রাছাড়া গেমিংকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

(৫) গেমিংয়ে ব্যস্ত বাচ্চারা অন্য কোনও কাজ করতে চায় না। বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলতেও তাদের অনীহা। সারাদিন নিজের ঘরে বন্দি। পড়াশোনায় গাফিলতি।

(৬) সব খেলার মতো অনলাইন গেমেও হার-জিত আছে। কিন্তু যেহেতু অনলাইন গেমে টাকা দিতে হয়, তাই হারলেই বাচ্চারা রেগে যায়। এই রাগ ধীর ধীরে তাদের দীর্ঘমেয়াদি মানসিক অবসাদের দিকে ঠেলে দেয়।

(৭) বেশিরভাগ অনলাইন গেম ভায়োলেন্সে ঠাসা। এই ভালোলেন্স তাদের মনকে জেদি, হিংস্র আর আগ্রাসী করে তুলছে। এর ফল ভবিষ্যতে মারাত্মক হতে পারে। সুতরাং, সাধু সাবধান!

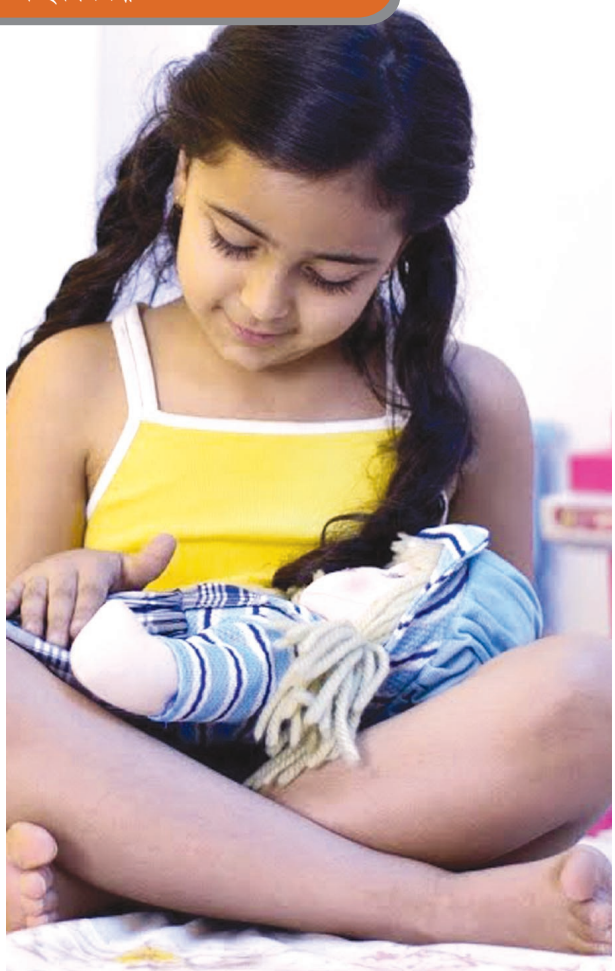

পুতুল ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা জানল না এই প্রজন্ম

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

'যাদুরে আমার আদুরে গোপাল, নাকটি নাদুস থোপনা গাল,
ঝিকিমিকি চোখ মিটমিটি চায়, ঠোঁট দুটি তায় টাটকা লাল।
মোমের পুতুল ঘুমিয়ে থাকুক দাঁত মেলে আর চুল খুলে-
টিনের পুতুল চীনের পুতুল কেউ কি এমন তুলতুলে?
গোবদা গড়ন এমনি ধরন আবদারে কেউ ঠোঁট ফুলোয়?
মখমলি রং মিষ্টি নরম-দেখছ কেমন হাত বুলোয়!
বলবি কি বল হাবলা পাগল আবোল তাবোল কান ঘেঁষে,
ফোকলা গদাই যা বলবি তাই ছাপিয়ে পাঠাই 'সন্দেশে'।

না, এ লেখা অবশ্য সুকুমার রায়ের সন্দেশের জন্য নয়। স্বস্তিকা খেলনার আলমারি ঘাঁটছে। খেলার ঝুড়িতে হাতড়ে দেখছে কী কী খেলনা বাঙ্গালি খেলেছে। খেলছে। এখনও কি আদুরে মামনি ঠোঁট ফুলানো তুলতুলে পুতুল নিয়ে খেলে? নাকি ওসব পুতুল শোকেশে সাজানো থাকে। খেলনারও রুচি যে দিনকে দিন বদলাচ্ছে। সবচেয়ে বড়ো বদল খেলনা এখন বাঙ্গালির হাতের নাগালে। সব সময় যখন যা চাই তখনই তা পাই। হাতের কাছে খেলনা যেদিন থেকে বাঙ্গালির সন্তান হাতে পেতে শুরু করল সেদিন থেকেই বোধহয় খেলনা সম্পদ থেকে ফেলনা হয়ে গেল। তাদের যত্ন পরিচর্যা, পরিপাটি করে পুতুলের নাম রাখা, গুছিয়ে রান্নাবাটির হাঁড়ি-কড়াই-খুন্তি আলাদা আলাদা ভাবে জমিয়ে রাখা, পুতুলের চিরুনি বাক্স, শীতকালে ঠাম্মাকে ঘ্যান ঘ্যান করে লাল টুকটুকে গালের পুতুলের জন্য বাড়তি উলের একটা সোয়েটার, বাঘ ভল্লুকের জন্য আলাদা কাঠের বাক্স যাতে নির্দিষ্ট মালিক ছাড়া আর কারোর হাত দেওয়া বারণ— সে সব এখন হারিয়ে গেছে। শৈশব এখন অনেক পরিণত। এখন শৈশব খেলনার খোঁজ করে কিন্তু চাহিদা কমেছে। কারণ আর সেদিন নেই যেদিন রথের মেলা, গাজন, চড়কের জন্য আপামর বাঙ্গালি শিশু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। হাতে নতুন খেলনা অসার ওটাই ছিল সময়। সুনির্মল বসু সাধে কি লিখেছিলেন— 'আটটি আনা পয়সা?'

'আটটি আনা পয়সা ছিল খোকন বাবুর ট্যাঁকে,
তাই নিয়ে সে ঘুমের মাঝে স্বপ্ন কত দ্যাখে।
রথের মেলায় কিনবে গাড়ি, খেলনা কত রং-বাহারি,
লাট্টু, লাটাই, মণ্ডা-মেঠাই কিনবে মনের সাধে...।'

এসব খেলনা এখন বস্তাপচা। আজকের শৈশব এসবে তৃপ্ত নয়। রথের মেলায় আগের আকর্ষণ 'হুতোম পেঁচার নকশা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহ বলেছিলেন, '...মাটির জগন্নাথ, কাঁঠাল, তালপাতের ভেঁপু, পাখা ও সোলার পাখি বেধরক বিক্রি হচ্ছে...'। কলকাতার চিৎপুর রোডের রথের মেলার বর্ণনা ছিল এটি। আজকে প্রত্যন্ত গ্রামে গেলেও নিশ্চিত এসব খেলনা পাওয়া দায়। কোথায় পাবো আজকে কাগজের কুমির? কাচের পাখি? তালপাতার সেপাই? চোরবাগানের লাট্টু? খেলনার চরিত্র বদলে গেছে। না, এ কোনো আফশোস করা না। এও এক বিবর্তনের দলিল। একান্নবর্তী পরিবার যেই ভাঙতে শুরু করল অমনি বাপ-মা খেলনায় আদিখ্যেতা যোগ করল। মাটির পুতুলকে খেদিয়ে দিল প্লাস্টিক। কাঠের রথ বা রং করা টানা গাড়ি তখন সস্তার খেলনা হয়ে গেল। একান্নবর্তী পরিবার সন্তানকে তার থেকে আধুনিক খেলনা দিতে পারে যে! গ্রামের কারিগরের হাতে ক্যাটক্যাটে রং লাগা কাঠের গাড়ির বদলে চলে এল চীনা খেলনা। কিন্তু কাঠের খেলনাকে যে পরিচর্যা করতে হতো, ওই যে বর্ষায় জল থেকে, স্যাঁতসেঁতে থেকে আগলে রাখা, পারলে আরও একবার রং করে— তা শিশুকে যত্ন করার প্রথম অভ্যাস তৈরি করাতো। আজকে নিউ মার্কেট বা যে কোনো বাজারে যে দরের খেলনাই দেখি না কেন তাতে পরিচর্যার পাঠ নেই। খেলার শেষে যেমন তেমন করে রেখে দেওয়ার মধ্যে একটা কালকের অগোছালো ব্যক্তি চরিত্রের আড়াল থাকছেই। পুতুল বাঙ্গালির এক নিজস্ব সিগনেচার।

পশ্চিমবঙ্গের বেড়াচাঁপার কাছে নজরগ্রামে তৈরি চাকা

লাগানো গোরুর গাড়ি রুদ্রকের লেখায়, 'মৃচ্ছকাটিকম্' নাটকের কথা মনে জাগে। বাদ যায় কেন ঘোড়ায় চড়া মাটির পুতুল! তারপর অবশ্য দম লাগানো পুতুল বাজারে অনেককাল রমরমিয়ে চলেছে। কেউ ঘাড় নেড়ে তাকায় তো কোনো ক্যাঙারু কট কট আওয়াজে লাফ দেয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর-মজিলপুরের পুতুল হালকা হতো, তাই ছেলেপুলেরা খুব পছন্দ করত। আজ যারা পঞ্চাশোর্ধ্ব তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে কালীঘাটের কোঁচা পরা বাবু, মেম পুতুলের কথা। সব মাটির ছিল। ঝুলনের পুতুল আবার দেবতার রূপে তৈরি হতো। চীনা পুতুল আর প্লাস্টিকের দৌলতে আজকের শৈশব জানেই না মুর্শিদাবাদের কাঠালিয়াতে পুতুলের মুখের কথা। খড়ির সঙ্গে অভ্র মিশিয়ে চকচক করত সেগুলো। হারিয়ে গেছে উত্তর দিনাজপুরের সুভাষগ্রামের চাকা লাগানো মাটির ঘোড়া, ষষ্ঠীপুতুল বা বাঁকুড়ার হিঙ্গুলা পুতুল। ঘাম ছুটে যাবে পশ্চিম মেদিনীপুরের জৌ পুতুলের সন্ধান পেতে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, কৃষ্ণনগরের ইউরোপীয় ঘরানার পুতুলের দাম এখন শৌখিন আলমারিতে আর সাহিত্যে। তারাও আজ লুপ্তপ্রায়। পাজি পাজি মুখ করে তাকিয়ে থাকা পাটের পুতুল কিংবা কাপড়ের পুতুলটিকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়েছে আজকের বার্বি ডল। বাঙ্গালির পুতুল খেলাঘর হেরে গেছে আন্তর্জাতিক বাজারের কাছে। নানা রকম বার্বি ডল এখন বাজার ছেয়ে যা নিঃসন্দেহে সুন্দর কিন্তু বাঙ্গালি শৈশব রুচি বদলে বাঙ্গলার পুতুল শিল্পীরা দিশেহারা। এখন যে আর ধুমধাম করে পুতুলের বিয়ে হয় না। রবি ঠাকুরের 'নতুন পুতুলে' যখন দাদু নাতনির পুতুল কথা কাটাকাটি চলছে তখন দাদু বলছেন, 'কিষণলালের' কথা। যে পুতুল গড়তে ওস্তাদ। কিন্তু আজ কী করুণ দশা টম টম পুতুলের। বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি টমটম খেলনা আজকে অতীত। তার জায়গা দখল করেছে ব্যাটারি চালিত খেলনা। ডিজিটাল গ্যাজেট আর ডিজিটাল খেলনা শৈশবের শুরুতেই লোকশিল্পীর ভাবনাকে ভো কাট্টা করে যন্ত্রমুখী মনন তৈরি করছে। বুদ্ধি খুলছে কিন্তু সুললিত আবেগ, কল্পনাশক্তি, সুকুমার প্রবৃত্তির ময়ূরপঙ্খী রথ উড়ছে কোথায়! প্লাস্টিকের খেলনার হম্বিতম্বিতে কাঁকসার ঘাড় নাড়া পুতুল পর্যন্ত ঘাড় নেড়ে না বলে দিয়েছে। ঘাড় নাড়া হুকো বুড়ো যে তার শিল্পীকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক জোগাতে ব্যর্থ। বুড়োর কি লজ্জা শরম নেই? ও তাই চুপ হয়ে গেছে।

আজকের খেলনা মানে ডিজিটাল মাধ্যমের হাতে খড়ি। ব্যাটারি দেওয়া গাড়ি, অ্যারোপ্লেন, ব্যাটারি চালিত পুতুল। বিশেষ করে খেলনার তালিকায় সবচেয়ে ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্রের নকলে খেলনা। বন্দুক, মেশিন গান, পিস্তল এসব শিশুমনের বিকাশে কতোটা ধনাত্মক ভূমিকা পালন করছে তা নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকবেই। একসময় বাঙ্গালি দলবেঁধে পটাশ (চিকন বাঁশের তৈরি খেলনা, বন্দুক জাতীয়) কিনত। ঠাস ঠাস ফাটাতে রাতা গাছের বীজ দরকার পড়ত। কিন্তু তা নিছক খেলা ছিল। শিশু মনে তা কোনোভাবেই সহিংসতার বীজ বপন করেনি। বাজারের বড়ো অংশ দখল করেছে চীনে নরম পুতুল যা দেখতে ভালো কিন্তু শিশু স্বাস্থ্যের জন্য শংসা পায় না। কলকাতা থেকে মফস্সল সর্বত্র এই খেলনাই মিলবে। হরেক দামে হরেক মাপের। একটা পুতুল ভেঙে গেলে যে কী যন্ত্রণা হয় তা যে জানলই না এই প্রজন্ম। শিশু ভোলানাথের 'পুতুল ভাঙা'— 'মাগো তুমি পাঁচ পয়সায় এবার রথের দিনে/সেই যে রঙিন পুতুলখানি আপনি দিলে কিনে/খাতার নীচে ছিল ঢাকা; দেখালে এক ছেলে, গুরুমশায় রেগে মেগে ভেঙে দিলেন ফেলে'। কী কাতর আবেদন পুতুল ভেঙে গেছে তাই। কিন্তু আজকের প্রজন্মের কাছে পুতুল একঘেয়ে হয়। নতুন চাইনিজ পুতুল আসে। চাইনিজ পুতুল ভাঙা কঠিন। ভেঙে গেছে বাঙ্গালি কারিগরের পুতুল, কারণ তা মাটি বা কাঠের বা শোলার। খেলনা শব্দ যতদিন পর্যন্ত খেলার জন্য ছিল ততদিন পর্যন্ত তাতে ছেলেমানুষি মাখা থাকত, খেলনা যেদিন থেকে কম খেলা আর বেশি বাণিজ্য হয়ে গেল সেদিন থেকে বাঙ্গালির পুতুলকে চীনা পুতুল মুখ ভেংচে বলতে শুরু করল— 'আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারী বিশ্রী।... চাইবে যদি কিছু তখন ধরব গলা চিপ্টে'। বীরবলের হালখাতায় প্রমথ চৌধুরী একদা বলেছিলেন, 'ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল'— এই আমাদের সত্যি।

বাঙ্গালির নিজস্ব পুতুল কতটা বাণিজ্যিক ভাবে চর্চা হবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকছেই। কিন্তু আজকেও খেলনা পুতুল বললে যে রূপ ভেসে ওঠে তা যে ষষ্ঠীঠাকরুনের 'ক্ষীরের পুতুল', যার জন্য রাজা-রানি- মন্ত্রী, ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সবাই হাজির। হিংসেয় ছোটো রানির বুক ফাটলেও পুতুল পরিচালিত করল একটা রাজত্বকে। বাঙ্গালির পক্ষেই এ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, কারণ বাঙ্গালি খেলনাকে খেলার মতো না নিয়ে মনন চরিত্র গঠনের মাধ্যম হিসেবে নিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, আজকে বাঙ্গালির নিজস্ব খেলনা পুতুল বলে আর কিছু নেই। খেলনা এখন বিশ্বায়নের হাতছানিতে রিমোটে চলছে। আগে বাঙ্গালির শৈশবে খেলনা দামি ছিল, তাই আগলে রাখত। আজকে দামি খেলনার যুগে খেলনা ভাঙছে না কিন্তু শৈশব অনেকটাই খান্ খান্।

শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট বিকেলগুলো

চন্দ্রভানু ঘোষাল

সেই দিনগুলো খুব দূরে নয়। সত্তর বা আশির দশকে যারা বড়ো হয়েছেন তাদের নিশ্চয়ই এখনও মনে পড়ে সেই দিনগুলো। স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে চারটে বেজে যেত। তারপর সামান্য কিছু নাকে মুখে গুঁজে ঘড়ির দিকে একবার তাকাতেই ভেসে আসত মন কেমন করা সেই ডাক, 'বুবাই, অ্যাই বুবাই! খেলতে যাবি না?' এই মাহেন্দ্রক্ষণে মায়েদের কিছু বলতে হতো না। তারা জানতেন ডাক যখন এসে গেছে তখন বাড়ির শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট হনুমানটিকে আর বাড়িতে আটকে রাখা যাবে না। ব্যাঙাচি লাফ লাফিয়ে সে এক্ষুনি পাড়ার একমাত্র খেলার মাঠটির দিকে দৌড়বে। খেলাই সেই বয়েসের সব থেকে প্রিয় কাজ। পড়াশোনা তো বাবা-মা'র জন্য করা। কিন্তু খেলার কথা কাউকে বলতে হয় না। বিকেল হলেই মন আপনা থেকেই ছুটে যায় খেলার মাঠে। তবে ছুটে গেলেই তো আর হলো না, কোন খেলাটা আজ খেলব আর কোনটা কাল— সেটা ঠিক করাও তো একটা সমস্যা। খেলা কি একটা? ফুটবল ক্রিকেট চিরকালই বাঙ্গালির প্রিয়। কিন্তু এছাড়াও তো আরও কতরকমের খেলা আছে। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে বা ছোটো শহরে ড্যাংগুলি ছিল খুবই জনপ্রিয়। হিন্দি গিল্লিডাণ্ডা থেকে বাংলায় ড্যাংগুলি। গুলিটি হতো একটা ছোটো কাঠের টুকরো আর ড্যাং কাঠেরই তৈরি অপেক্ষাকৃত লম্বা লাঠির মতো। এই খেলাটি অনেকটা ক্রিকেটের মতো। গুলির একপ্রান্তে ডাণ্ডা দিয়ে মেরে তা শূন্যে তুলতে হয় তারপর শূন্যে থাকা অবস্থায় আবার ডাণ্ডা দিয়ে মারতে হয়। গুলিকে অনেক দূরে পাঠানোই হিটারের লক্ষ্য। কিন্তু গুলি শূন্যে থাকা অবস্থায় প্রতিপক্ষের কোনও খেলোয়াড় যদি লুফে নেয় তাহলে হিটার আউট।

কাঁচের বা মার্বেলের গুলি খেলা ছিল আরেকটি জনপ্রিয় খেলা। শহর গ্রাম নির্বিশেষে সব জায়গায় কচিকাঁচারা পকেটভর্তি গুলি নিয়ে মাঠেঘাটে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। গোল দাগ টেনে বধ্যভূমি রচনা করে পকেটের গুলি দিয়ে সেইদিকে তাগ করত সেদিনের নবীন তিরন্দাজ... থুড়ি, গুলিবাজ। সেই সময় প্রায় প্রত্যেক পাড়ার মাঠেই দুর্গাপুজো হতো। পুজোর মণ্ডপ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যাবার পর মাঠে জায়গা আর বিশেষ থাকত না। মাঠের একটি নিরাপদ কোণ বেছে নিয়ে সেখানে শুরু হতো গুলিখেলা। খেলার পর জেতা গুলি পকেটে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় নিজেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের থেকে কম কিছু মনে হতো না।

ইন্ডোর গেমসের দুনিয়াতেও তখন রকমারি বৈচিত্র্য। লুডো, ক্যারম, ব্যবসায়ী, বাগাডুলি...কত নাম করব! মেয়েদের সব খেলাই তখন ইন্ডোর গেমস। ছাদে, বারান্দায়, উঠোনে চলত এক্কা দোক্কা, ভাত-চাবি, বুড়িবসন্ত, কুমিরডাঙা থেকে শুরু করে পুতুলখেলা ও খেলনাবাটি পর্যন্ত। আট বছরের মেয়ে তাগ করত বড়ো গঙ্গার দিকে। কিন্তু ছোটো হাতে কি সবসময় অত জোর থাকে? প্রায়ই ঘর ভুল করে ঘুঁটি গিয়ে পড়ত তেক্কা বা চৌঠায়। সেই দানটায় বেচারির আর কিছু করার থাকত না। কী করা যাবে, এক্কা-দোক্কার এটাই যে নিয়ম।

পুতুলখেলার কোনও সময়-টময় নেই। দুপুর বিকেল সন্ধ্যে রাত— সুযোগ পেলেই বসে পড়া যায়। নিয়ম মোটামুটি একই। পুতুল যারা খেলে তারা প্রত্যেকেই যে-যার পুতুলের মা। বাড়িতে আসল মা তাঁর মেয়ের সঙ্গে যে-ব্যবহার করেন সেটাই মেয়ে তার পুতুলকন্যার সঙ্গে করে। মাঝে মাঝে পুতুলের বিয়ে দেওয়া হয়। এ বাড়ির মেয়ের পুতুলের সঙ্গে ও-বাড়ির মেয়ের পুতুলের বিয়ে। দু'জনেই হবু শাশুড়ি। দম ফেলার সময় নেই। সেই সময় পুতুলখেলার মধ্য দিয়ে মেয়েরা তাদের ভাবী গার্হস্থ্য জীবনের একটা আন্দাজ পেয়ে যেত। পুতুলের মা হয়ে খেলতে খেলতে মাতৃত্বের ছেলেমানুষি আস্বাদ সে পেয়ে যেত ওই বয়েসেই। সেই কারণেই বোধহয় দশ বছরের জ্যেষ্ঠার কাছে ছ'বছরের কনিষ্ঠাকে রেখে তাদের মা সচ্ছন্দে সংসারের অন্য কাজ করতে পারতেন। দিদিও সানন্দে পালন করত প্রক্সি মায়ের দায়িত্ব।

পুতুলখেলার সঙ্গে মেয়েদের আরও একটি খেলার কথা না বললেই নয়। সেটি হলো খেলনাবাটি। ঠোঁট ফোলানো অভিমানের সেই বিকেলগুলোতে ছিল রান্নাবান্নার দেদার আয়োজন। গাছের পাতা হতো লুচি, ইটের টুকরো হতো ভাত আর জল হতো তেল বা ডাল। অন্নব্যঞ্জনের গন্ধে সারা বাড়ি একেবারে ম ম করছে। উপকরণ যাই হোক, ভালোবাসায় কী না হয়! দশ বছরের মেয়ের রান্না করা মিছিমিছি লাউয়ের ঘণ্ট খেয়ে বাবার চোখেও জল!

এরকমই ছিল সেই বিকেলগুলো। এরকমই ছিল সেই ফলে আসা পৃথিবীর ছোটোবেলা। আমরা সবাই ছিলাম অফলাইনে। দুই বন্ধুর মাঝখানে দূরত্ব বাড়িয়ে অনলাইনে চলে যাবার কথা তখন ভাবাই যেত না। □

দেশীয় উদ্যোগের সামনে নতজানু চীনা দৈত্যের খেলনা

নিখিল চিত্রকর

সে ছিল নব্বইয়ের দশক। মাছিধরা সন্ধ্যায় খাস কলকাতার স্ট্রিট লাইটগুলো ঝপ করে নিভে গিয়ে লোডশেডিং হতো। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠতো কেরোসিনের লম্ফ। এমার্জেন্সি লাইট, ইনভার্টার সেসব অনেক পরের কথা। কারেন্ট অফ মানেই আমাদের পড়াশোনা লাটে। কচিকাঁচারা তখন দল বেঁধে ছাদের উপর। কারও হাতে চাটাই, কারও সঙ্গী মাদুর। ঠাকুমা'কে ঘিরে ধরে সবাই গোল হয়ে বসতাম। শুরু হতো রূপ কথার গল্প। শহর কলকাতার আনাচে কানাচে দোকানগুলোয় তখন মোমবাতি বা হ্যাজাকের আলো। ঘুগনির কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ, বয়ামে রাখা চুইং গাম, ছাঁকা তেলে মুচমুচে তেলেভাজা, হাতটানা রিকশার ঝিমুনি— সব মিলিয়ে আলো-আঁধারির সে কলকাতাকে যক্ষপুরীর মতো মায়াবী মনে হতো। ছেলেবেলার জন্মদিনগুলো ছিল সবচেয়ে মজার। একবারের জন্মদিনে একটা বন্দুক পেয়েছিলাম। দিয়েছিলেন আমার ছোট পিসেমশাই। সেটা নিয়েই প্রথম চোর-পুলিশ খেলা। ফি পুজোয় ক্যাপ ফাটানো টিনের বন্দুক ছিল বাঁধাধরা। আরেকটু বড়ো হতে দেখলাম এক্কেবারে হিন্দি সিনেমার ভিলেনদের হাতে থাকা পিস্তল, রিভলভার, একে-৪৭, কার্বাইনের মতো খেলনা বন্দুক। সেগুলো মেড ইন চায়না।

১৯৯৭ থেকেই এদেশে চীনে তৈরি খেলনার রমরমা। ট্রেনে হকারদের কাছে, ফুটপাথে, পাড়ার দোকানে আধুলিভাগ খেলনাই চীনে তৈরি। আমাদের ঘাড়নাড়া বুড়ো, বর-বউ, টমটম গাড়ি, কাঠের খেলনা চীন দেশীয় খেলনার ভিড়ে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকলো। হালফিলে ঘুড়ি ওড়ানোর মাঞ্জাতেও ভাগ বসিয়েছে চাইনিজ সুতো। নিউ মার্কেট, পাইকপাড়া, পার্ক স্ট্রিট-সহ নানা জায়গায় গজিয়ে উঠেছে চাইনিজ খেলনা বাজার। অনেকে বলেন প্রযুক্তির দিক থেকে চীনের খেলনা উন্নতমানের ও যথেষ্ট টেকসই। দামও অনেক কম। আম জনতার নাগালের মধ্যে। তাছাড়া চিনের খেলনা বিক্রি করে মোটা অঙ্কের মুনাফা পান বিক্রেতারা। তাই তাঁরাও বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে চাইনিজ খেলনা বিক্রি করেন। যেকারণে স্বদেশি খেলনার চাহিদা এদেশের বাজারে একসময় প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছিল। তাছাড়া উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা ঠিক যে ধরনের খেলনা পছন্দ করে, তেমন খেলনা বা উন্নত ডিভাইস স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করতে সিদ্ধহস্ত চীন। তার উপর আমদানি শুল্কও কম। তাই এদেশের খেলনা

ফঃ ৪

বাজার ঢালাও অধিকারের সুযোগ পেয়েছে চীন।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ভারতীয় খেলনার প্রচলন কবে, কীভাবে, কাদের হাত ধরে হয়েছে তার কোনো হদিশ নেই। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, মহেঞ্জোদারো-সহ ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানেও পুতুল তৈরি হতো। সেইসব প্রত্নস্থলের স্থাপত্যকর্মে পুতুলের বিভিন্ন কারুকাজ লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে দেব-দেবীর মূর্তি, বনের পশুপাখি উল্লেখযোগ্য। পোড়ামাটির সেইসব খেলনায় নান্দনিকতা ও সৃজনশৈলীর ভাব স্পষ্ট। ছেলেবেলায় মায়ের মুখে শুনেছিলাম, শৈশবে মায়ের প্রিয় সঙ্গী ছিল 'পুটু' বলে একটা কাচের পুতুল। তাতে যে এদেশের কারিগরদের হাতযশ ছিল তা বলাই বাহুল্য। সেসব এখন আর নেই। চাহিদা অপ্রতুল বলে পুরনো খেলনার ইন্ডাস্ট্রিতে তালা ঝুলেছে বহু আগেই। তার জায়গা নিয়েছে প্লাস্টিক, ফোম, রবার ও নানা মিশ্র রাসায়নিকে তৈরি পুতুল। যা পরিবেশবান্ধব তো নয়ই বরং অনেকক্ষেত্রে শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। যেসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানার রমরমা ছিল, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজস্বতা হারিয়ে খোল-নলচে বদলানোর চেষ্টা করছে। দামের পাল্লায় পেরে ওঠেনি। এদেশের খেলনার বাজার মানেই চাইনিজ এমনটাই ভাবতে শুরু করেছিল আটপৌরে জনতা। তবে শুধু চীনের কাছেই প্রযুক্তি আছে, আমাদের কাছে নেই এমনটা ভাবা ভুল। খেলনা শিল্পে ভারতের কাছে ঐতিহ্যের পাশাপাশি প্রযুক্তিও আছে। পৌরাণিক কনসেপ্টের সঙ্গে দক্ষতাও আছে। ভারতই একমাত্র দেশ যে বিশ্বকে পরিবেশবান্ধব খেলনার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। এদেশের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা কম্পিউটার গেমগুলির মাধ্যমে ভারতের সাবেক কাহিনি, যেগুলি ভারতের মৌলিক সম্পদ সেগুলি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১০০ বিলিয়ন ডলারের আন্তর্জাতিক খেলনা বাজারে ভারতের অংশীদারিত্ব খুবই কম। দেশের ৮৫ শতাংশ খেলনা বাইরে থেকে আসে। তবে এই ছবিটা এবার বদলে যাবে বলে আশা করছে ভারতের খেলনা শিল্পমহল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খোদ খেলনা শিল্পে ভারতের আত্মনির্ভর হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। খেলনা শিল্পে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দিন এবার শেষ হতে চলেছে। খেলনা শিল্পে আত্মনির্ভর হবে ভারত। এক্ষেত্রে চীনকে টেক্কা দেবার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক। ভারতের খেলনা হবে পরিবেশবান্ধব ও প্লাস্টিকবিহীন। নিষিদ্ধ রাসায়নিক রহিত। ভারতের খেলনা বাজার এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। কিন্তু দুঃখের কথা এর বেশিরভাগই চীনের দখলে।

সম্প্রতি চীন থেকে আসা খেলনার ওপর আমদানি শুল্ক প্রায় ২০০ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত সরকার। যার ফলে ওদের সস্তার খেলনা ভারতে তৈরি খেলনার দামের চেয়ে মহার্ঘ হয়েছে। চাইনিজ খেলনার ওপর আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করে দেবার পর দেশীয় সংস্থাগুলির তৈরি রোবট ও অন্যান্য খেলনা সুলভে উৎপাদন করা যাবে। তুলনায় চাইনিজ খেলনার পণ্য বিক্রির হার নিশ্চিতভাবেই হ্রাস পাবে। খেলনা শিল্পের জগতে ভারতে একটি বড়ো নাম 'ডক্টর ম্যাডিজ টয়'। তার কর্ণধার অনির্বাণ গুপ্ত জানিয়েছেন, বাচ্চাদের যেসব ব্যাটারি ও রিমোট চালিত খেলনা চীন থেকে আসতো সেগুলো সবই খড়্গপুরের কারখানায় দেশীয় কাঁচামাল ও টেকনোলজি ব্যবহার করে তৈরি করা শুরু হয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ভারতে চাইনিজ খেলনার আমদানি ৬০-৭০ শতাংশ কমে গেছে। বর্তমানে এদেশের খেলনার বাজারে বছরে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার খেলনা বিক্রি হয়। কয়েক মাস আগেও এর প্রায় ৮০ শতাংশ ছিল চীনের হাতে। দ্য টয় অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে ভারতের ১০ হাজার মতো খেলনার কারখানা সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে পরিবেশবান্ধব খেলনা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। যা আগামীতে বিশ্বের খেলনার বাজার দখলের সম্ভবনা তৈরি করবে। এ বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। ভারতকে খেলনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে ভারতের স্থানীয় খেলনা ও ফ্যান্টাসি গেমিং (কল্প ক্রীড়া) শিল্পের সমন্বয় সাধন করে গত বছর ফেব্রুয়ারিতে সর্বপ্রথম ডিজিটাল টয় ফেয়ারের আয়োজন করা হয়েছিল, যা এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। শুধু তাই নয়, সৃজনশীল খেলনা ও কল্প ক্রীড়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে অনলাইন টয় হ্যাকাথন 'টয়ক্যাথন'-এর সূচনা করে কেন্দ্র। টয়ক্যাথন -২০২১ ছিল এমন এক অভিনব উদ্যোগ যেখানে ভারতের সৃজনশীল চিন্তাভাবনার মেলবন্ধন ঘটেছে এবং ভারতীয় সভ্যতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, পুরাণকাহিনি ও মূল নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে এই উদ্যোগ পরিচালনা করেছে ভারত সরকার। এই উদ্যোগে খেলনা অনুরাগী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্টার্ট আপ, পেশাদার ও খেলনা বিশেষজ্ঞরা অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম রেডিয়োয় 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে যুবসমাজকে খেলনার বাজারে স্টার্ট আপ শুরু করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেদিন তিনি বলেন, '' খেলনা শিল্পে ভারতের অংশীদারিত্ব বাড়াবার সময় এসেছে। যদি দেশকে আত্মনির্ভর বানাতে হয় তাহলে পুরো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া দরকার।'' বিশেষজ্ঞদের মতে খেলনা কারখানা তৈরির জন্য সরকারের কাছ থেকে জমি ও কম সুদে ব্যাঙ্ক-ঋণ পেলে ভারত খেলনা শিল্পে সারা বিশ্বে সেরা রপ্তানি হাব হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এদেশের খেলনা শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলোর করায়ত্ত। তাই খেলনা শিল্পের প্রসারে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাও তৈরি হবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করছি যে, ভারতের বাচ্চারা নতুন নতুন খেলনা কী করে পাবে। ভারত খেলনা বাজারের বড়ো কেন্দ্র। আর এই কারণে দেশে খেলনার নতুন শিল্প আর কারখানা শুরু করা উচিত। এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সবরকম সহযোগিতা করবে কেন্দ্র সরকার। লোকাল খেলনাকে ভোকাল বানাতে হবে। ভারতের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের আরও কম্পিউটার গেম বানাতে হবে। যা হবে বিনোদনমূলক কিন্তু ঝুঁকিহীন ও স্বাস্থ্যসম্মত।''

দেশীয় খেলনা শিল্পের গতি ত্বরান্বিত করতে আমদানি করা খেলনাগুলির প্রত্যেক পর্যায়ে স্যাম্পল টেস্টিঙের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সাল থেকেই অনিবার্যভাবে বিদেশি খেলনার কোয়ালিটি টেস্টে নজর দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ভারতের ২৪টি প্রধান শিল্পের মধ্যে খেলনা শিল্পকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল টয় অ্যাকশন প্ল্যান। এতে ১৫টি মন্ত্রক ও বিভাগকে শামিল করা হয়েছে খেলনা শিল্পে ভারতের আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে। ভারতের শিল্পব্যবস্থা ও আর্থিক পরিকাঠামো এবার সমৃদ্ধ হবে শৈশবের খেলনার হাত ধরে। প্রথম লক্ষ্য হলো ভারতীয় শিশুর খেলনা থেকে চীনা ভাইরাস ঝেড়ে ফেলা। দ্বিতীয় লক্ষ্য, দেশীয় মিথ ও সময়োপযোগী প্রযুক্তির মেলবন্ধনে পরিবেশবান্ধব মেড ইন ইন্ডিয়া খেলনার বিশ্বের বাজারে পদার্পণ করা। লক্ষ্য অনেক বড়ো। তবে লক্ষ্য যখন আত্মনির্ভরতার, সমবেত প্রচেষ্টায় তার পূরণ সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ■

দক্ষিণ অসম প্রান্তের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত ৮ মে শ্রীগৌরীস্থিত মাধবধামে। উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল মাধবধামে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বর্গের শুভারম্ভ করেন। প্রান্তের সাতটি জেলার ৩৯ স্থান থেকে ৫৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তীর্ণ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী সমস্ত শ্রেণীর এবং বাংলা, হিন্দি, চা-বাগানের জনজাতি, কন্নড়, ডিমাসা প্রভৃতি ভাষাভাষী স্বয়ংসেবক ছিলেন। শিবিরে বর্গাধিকারী রূপে কুলমণি মিশ্র এবং বর্গ কার্যবাহ রূপে ছিলেন সুভাষ চন্দ্র নাথ।

কুড়ি দিবসীয় বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন গুরুচরণ কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা 'অভ্যন্তরীণ গুণগত মান নিশ্চিতকরণ কোষ'-এর সংযোজক ড. অপ্রতীম নাগ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল মহান্তি।

তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ, নাগপুর

গত ৯ মে থেকে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শুরু হয়েছে। ২ জুন পর্যন্ত চলবে। সারা দেশ থেকে ৭৩৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি প্রান্তের ৪৪ জন। বর্গে সর্বাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মধ্যভারত প্রান্তের সঙ্ঘচালক অশোক পাণ্ডে এবং কার্যবাহ হিসেবে রয়েছেন ক্ষেত্র কার্যবাহ খোয়াই রাজেন সিং।

পার্কচেস্টারে অনুপ দাস অ্যাকাডেমির বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

গত ১৪ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অনুপ দাস অ্যাকাডেমির উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় বাংলা বর্ষবরণ-১৪২৯ অনুষ্ঠান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় হলভর্তি দর্শক যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য চলে গিয়েছিলেন ফেলে আসা স্মৃতিবিজড়িত জন্মস্থান বাংলাদেশে। প্রবাসে বেড়ে ওঠা এই ছেলে-মেয়েরা যেমন রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতির সঙ্গে চমৎকার নৃত্য পরিবেশন করেছে, তেমনই ক্লাসিক্যাল নৃত্যেও তারা তাদের পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছে। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গুণী শিল্পীদের পরিবেশনায় দর্শকরা উপভোগ করেছেন গান ও আবৃত্তি। আবৃত্তি পরিবেশন করেছেন প্রবাসের জনপ্রিয় বাচিক শিল্পী শুক্লা রায়, আবীর আলমগীর, ক্লারা রোজারিও। নৃত্য পরিবেশন করেছেন আড্ডার শিক্ষিকা আভা ভাট নাগ রয়, মিথান দেব (আড্ডার শিক্ষক), ঈশানী, রিমা, চৈতন্য, ঈশা, তিশা, অর্পিতা, কৃষ্ণা, তুলসী, রিয়া, অদিতি, পারমিতা, সংহিতা, অমৃতা, রুচি, সৃষ্টি, আদ্রিকা, জয়িতা। সব শেষে ছিল গানের পর্ব। সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পী রুপা আহমেদ, তিমির রায়, সৈয়দ আব্দুল হাদী। এছাড়াও ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী তাজুল ইমাম।

অনুপ দাস অ্যাকাডেমির পরিবেশনায় বহুদিন পর প্রবাসী বাঙ্গালিরা এরকম একটি চমৎকার ও পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে পদক প্রাপ্ত ড. নুরুন্নবী। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বজিৎ (মুক্তধারা), ড. জিনাত নবী (সংগঠক)। নাচের কোরিগ্রাফ করেছেন গুরু অনুপ কুমার দাস, গুরু আভা ভাট নাগ রয় (শিক্ষিকা), মিথান দেব(শিক্ষক ও প্রোগ্রাম পরিচালক)। তবলায় ছিলেন তপন মোদক, মন্দিরা, শহীদ উদ্দিন। যন্ত্র সংগীতে মাটি ব্যান্ড। লিড গিটার— আহমেদ টিটু। মঞ্চসজ্জায়— টিপু আলম। কারিগরি সহযোগিতায় অর্জুন সাহা। স্থিরচিত্রগ্রহণে তুষার আহমেদ। ব্যবস্থাপনায় আল্পনা গুহ, সুরাইয়া আলম, মিথান দেব। সহযোগিতায় রনি বড়ুয়া, সদানন্দ ঘোষ, গণেশ ভৌমিক, অরূপ দাশ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন গোপেন সাহা।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির রক্তদান শিবির

গত ১৫ মে মালদহ নগরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে সকাল ৯টায় স্থানীয় অরবিন্দ ছাত্রাবাসে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সহ প্রান্ত কার্যবাহিকা শ্রীমতী গরিমা বেঙ্গানিয়া, প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ মানসী ভৌমিক ও বিভাগ কার্যবাহিকা রুম্পা দাস। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ী। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় চিকিৎসক শ্রীমতী দেবশ্রী দাস। শিবিরে ১০ জন মহিলা-সহ ২০ জন রক্ত দান করেন। শিবির সাফল্যমণ্ডিত করতে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন জেলা কার্যবাহিকা শ্রীমতী সুজাতা মিত্র এবং সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য প্রবীর মিত্র।

জামাইষষ্ঠী শুধুই পঞ্জিকায়

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'অরণ্য' চুরি :

'চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে'। জামাইষষ্ঠীর কথায় 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের এই কথাটিই কানে বাজে অবিরত। মনে হতে পারে, এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত। জামাইষষ্ঠীর সঙ্গে 'রাজকোষে চুরির' সম্পর্কটা কী। একথা তো সকলেই জানেন বাঙ্গালির সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত এবং আনন্দের অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম এই জামাইষষ্ঠী। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলেই নিজের নিজের বাড়িতে করেন এই উৎসবের আয়োজন। এমন একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে চুরির সম্পর্কটা কী?

উত্তরে অনেকে বলেন, এটা যে সে চুরি না, এটা রীতিমতো ছিনতাই— ইংরেজিতে যাকে বলে হাইজ্যাক।

কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনালেও বিচার বিশ্লেষণ শেষে মনের দোলাচল হবেই। যুক্তিগুলি যে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। বাঙ্গালির সর্বস্তরের মানুষের এতো বড়ো একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে একমাত্র পঞ্জিকায়। বৈদিক কোনো প্রশ্ন তো বটেই, পুরাণ, মহাকাব্য অথবা হিন্দুর ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রক স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীতে অরণ্যষষ্ঠী পুজোর বিধান থাকলেও তাতে জামাইষষ্ঠী বা জামাই আদরের কথা নেই আলাদাভাবে। আর সেখানেই প্রশ্ন, অরণ্যকে সরিয়ে এই ষষ্ঠীর আগে 'জামাই' শব্দটা জাঁকিয়ে বসল কবে এবং কীভাবে?

'জাময়' থেকে জামাই :

সংস্কৃতে 'জামি' বলতে বোঝায় কন্যা বা বধূকে। জামির বহুবচন 'জাময়' আর ওই ভাবেই ভাগ্নাদের বলা হয় 'জামেয়'। এর থেকেই অনুমান, 'জাময়' বা 'জামেয়' উচ্চারণ দোষে অথবা অপভ্রংশে 'জামাই' হয়ে যুক্ত হয়েছে ষষ্ঠীর সঙ্গে। সামাজিক কারণেই কালে 'জামাই'য়ের আড়ালে চলে গিয়েছে অরণ্য। আর সেটাকেই বলা হচ্ছে ভাষা ছিনতাই।

হতে পারে এটা একটা সম্ভাব্য কারণ। তবে

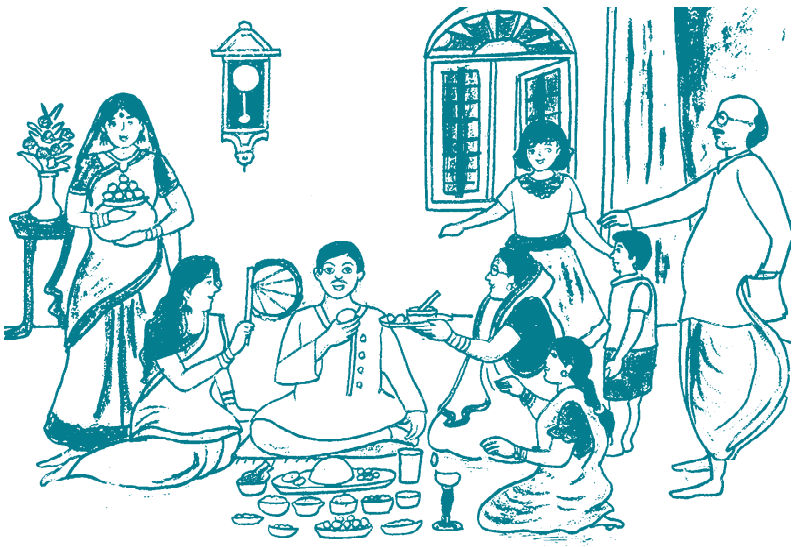

সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন অন্যকথা। তাঁদের মতে, মোটামুটি সপ্তদশ-অষ্টাদশ থেকে শুরু জামাইষষ্ঠীর। এবং সেটাও শুরু হয়েছিল এক ধরনের সামাজিক প্রয়োজনে।

সেকালে চালু ছিল বাল্যবিবাহ। নিয়ম ছিল সন্তানবতী না হওয়া পর্যন্ত বউ যেতে পারবে না বাপের বাড়িতে। অন্যদিকে বউয়ের বাবা-মা-রাও আসতে পারবেন না মেয়ের বাড়ি। এলেও নাতি-নাতনি না হওয়া পর্যন্ত অন্নগ্রহণ করবেন না সেখানে। ফলে দেখা দেয় এক ধরনের সামাজিক সংকট। সেই সংকটত্রাণেই জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী পুজোর দিনে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করা হতো মেয়েদের।

পুজো বলে কথা। তাই মেয়েদের সেদিন বাপের বাড়ি আসায় বাধা থাকত না। বউদের নিয়ে আসতেন জামাইরা। মেয়ে আসার আনন্দে বাবা-মায়েরা সেদিন জামাইকেও নানা ভাবে খাতির যত্ন করা শুরু করেন। আয়োজন করেন ভুরিভোজের। দেন নানা উপহার। এসব করার একটাই উদ্দেশ্য, পরের বার জামাইরা নিজেরাই এদিন আসার ব্যাপারে একবারে উদাসীন হয়ে থাকবেন না।

আরও একটা কারণেও মনে হয়, জামাইষষ্ঠী পরবর্তীকালের সংযোজনা। এখনও যে বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়নি, সেখানেও মায়েরা সন্তানদের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীর পুজো করেন। এবং জামাই না থাকা সত্ত্বেও দিনটিকে জামাইষষ্ঠীই বলা হয়। আর এসব থেকেই মনে হয়, আদিতে যা ছিল সন্তানদের কল্যাণ কামনার অনুষ্ঠান তারই পরিবর্তিত রূপ আনন্দের জামাইষষ্ঠী।

ষষ্ঠী কোনো বৈদিক দেবী নন। ষষ্ঠী মূলত পৌরাণিক দেবী। বিভিন্ন পুরাণ কথায় ষষ্ঠী হলেন মূলত সন্তানদাত্রী, তার রক্ষাকর্ত্রী এবং সন্তান-অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি আদ্যাশক্তি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ থেকে উদ্ভূতা— তাই তাঁর নাম ষষ্ঠী দেবী। ইনি কৌমারী, দেবসেনা, বালি, স্কন্দজায়া, ছটি মাই ইত্যাদি নামেও সুপরিচিতা।

সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে রয়েছে প্রতি শুক্ল ষষ্ঠীতেই দেবীর আরাধনা করার বিধান। তার একই নামে তিনি পূজিতা হন না প্রতি মাসে। বারোটি মাসে তাঁর পুজোর দিনটি বারোটি নামে চিহ্নিত। যেমন বৈশাখ মাসে ধুলাষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে কোড়াষষ্ঠী, শ্রাবণে নোটন, ভাদ্রে মন্থন বা চাপড়া, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্তিকে গোটা, অগ্রহায়ণে মূলা, পৌষে পাটাই,

মাঘে শীতল, ফাল্গুনে অশোক আর চৈত্রে নীল। প্রসঙ্গত, চৈত্রের নীলষষ্ঠী ছাড়া আর সব ষষ্ঠীরই পুজো হয় শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে। একমাত্র নীলষষ্ঠীর নির্দিষ্ট কোনো তিথি নেই। নীলষষ্ঠীর পুজো হয় চৈত্র মাসে চড়কের ঠিক আগের দিন।

নাম যাইহোক, সব ষষ্ঠীরই ধ্যানমন্ত্র এক। সেই ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ী তিনি গৌরবর্ণা, দ্বিভুজা, উত্তমবসন ও অলংকারে বিভূষিতা, চন্দ্রাননা এবং কৃষ্ণমার্জার বাহনা। পীনোন্নতা দেবীর কোলে একাধিক শিশুপুত্র। দেবী জগদ্ধাত্রী। আর এটা নিয়েই দেবী জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে রয়েছে তাঁর একট সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সিংহবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতেই বাঘের মাসি বিড়ালকে ষষ্ঠীদেবী করেছেন বাহন। অন্যমতে, বিড়াল হলো প্রজনন শক্তির প্রতীক। আর এই লোকবিশ্বাস থেকেই ষষ্ঠী হলেন মার্জার বা বিড়ালবাহনা।

লোকায়ত আচার :

ষষ্ঠীপূজা এক লোকায়ত আচার। সাধারণত বটগাছের নীচে বাড়ির উঠোনে, নদী বা পুকুরের ধারে হয় ষষ্ঠী পুজো। তেল-হলুদ-ঘট, বটের ডাল ইত্যাদি উপকরণে পুজো করেন গৃহবধূরা। পুজো শেষে ব্রতকথা শুনে স্নান করে বাড়ি ফিরে ফলাহার করেন। বহু গ্রামে ষষ্ঠীপুজোর জন্য আছে ষষ্ঠীতলা। এখন অবশ্য বাড়িতেই এইসব উপকরণে পুজো করা হয়। ষষ্ঠীপুজোয় বটতলা হলো ষষ্ঠীর আটন অর্থাৎ বটের সঙ্গে সংযুক্ত তিনি, তাই তাঁর অন্য নাম বটবিটপবিলাসিনী। জ্যৈষ্ঠে অরণ্যে গিয়ে পুজো করা হয় বলে তিনি হলেন অরণ্যষষ্ঠী।

জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী পুজোতে বিশেষ করে লাগে সাতটি সতেজ বাঁশপাতা বা বাঁশের কোড়ুল, গোটাফল পাঁচ-সাতটি, তালের পাখা একটি, একগুচ্ছ দূর্বাঘাস। দই-হলুদ-তেল, ষষ্ঠীর ডোর বা সুতো। তাছাড়া লাগে করমচা, কাঁচা সুপুরি, খেজুর ছড়া। কোথাও কোথাও এর সঙ্গে থাকে তালপাতা কেটে তৈরি ছোটো পাখা, ধনুক ইত্যাদি। নৈবেদ্যে দেওয়া হয় আম, কলা, লিচু, কালোজাম ইত্যাদি মরশুমি ফল।

এই অরণ্যষষ্ঠী পুজোর আদিতে মহিলারা জ্যৈষ্ঠের গরমে দগ্ধ জমিতে বৃষ্টি ও ভালো ফলনের আশায় বনে গিয়ে গান গেয়ে পুজো দিয়ে বনদেবীকে সন্তুষ্ট করতেন। তাতে নামতো বৃষ্টি। এই ভাবে নারী আর কৃষি সমার্থক হয়ে উঠলো। অরণ্যের দেবী হলেন প্রজননের দেবী। অরণ্যে পূজিতা ষষ্ঠী হয়ে উঠলেন নারীর ফসল অর্থাৎ সন্তানের রক্ষয়িত্রী।

ব্রত থেকে ব্রাত্য :

ষষ্ঠীকে বলা হয় ব্রতের দেবী। বিশেষজ্ঞরা ব্রতকে ভাগ করেছেন তিনটি শ্রেণীতে যথা— (১) আত্মজন্য, (২) সমাজজন্য এবং (৩) সম্বন্ধ জন্য। জামাইষষ্ঠীকে যোগ করা হয় তৃতীয় শ্রেণীতে। সন্তান ও সন্তানসমদের কল্যাণের জন্য পালন করা হয় এই ব্রত।

মনে করা হয় এই ষষ্ঠীব্রত এসেছে আদি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে। ওই কারণেই ষষ্ঠীকে বলা হয় বুড়ি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন :

দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উসনাদে।
ফেড়িয়া চালের ঘড় জ্বালিল আঁতুড়ি।
গো-মুণ্ডে থুইয়া দ্বার পূজে ষষ্ঠী বুড়ি।।

ষষ্ঠীব্রত মূলত মেয়েলি। বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্মের ব্রত পালনকারীদের বলা হতো ব্রাত্য। বেদের যুগে প্রধান্য ছিল যজ্ঞের। যজ্ঞকারীরা হলেন আর্য আর ব্রত ইত্যাদি অনুসারীরা চিহ্নিত হলেন ব্রাত্য হিসেবে। ব্রাত্য শব্দটি এখন যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, আদি অর্থ সেটা ছিল না।

পুরাণের যোগ :

প্রথমে বিভিন্ন ষষ্ঠীপুজোর উৎস যেটাই হোক, পরবর্তীকালে কিন্তু পুরাণের রূপসাগরে স্নান করিয়ে তাঁকে দেওয়া হয়েছে একটা পৌরাণিক রূপ। একদা মনসা বা শীতলার মতো ষষ্ঠীও ছিল অর্বাচীন স্তরের দেবী। পরবর্তীকালে এই ষষ্ঠী দেবীকে বলা হলো দেবী দুর্গারই একটি রূপ। ওইখানেই শেষ নয়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে তিনি হলেন স্কন্দ বা কার্তিকের পালিকা মা। স্কন্দ পুরাণে তিনি হয়ে গেলেন স্কন্দের স্ত্রী, বায়ুপুরাণে তিনি ঊনপঞ্চাশ দেবীর অন্যতম আধার। অন্যত্র তাঁকেই বলা হলো সমস্ত মাতৃদেবীর মধ্যে আরাধ্যতম দেবী।

এতো হলো দেবী ষষ্ঠীর রূপান্তরের কিছু খণ্ডচিত্র। একই ধারায় জামাইষষ্ঠীকে একটা পৌরাণিক রূপ দেওয়ার জন্য উল্লেখ করা হয় মহাভারতের একটি কাহিনির। বনবাসে অর্জুন বিয়ে করলেন মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে। নববধূ-সহ অর্জুনকে যেদিন মণিপুর রাজপ্রাসাদে বরণ করে নানাভাবে আপ্যায়িত করা হয়, সেই দিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠের শুক্লাষষ্ঠী। আর সেদিন থেকেই নাকি যাত্রা শুরু জামাইষষ্ঠীর।

দেবী ষষ্ঠীকে পৌরাণিক রূপ দিতেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উল্লেখে রয়েছে, দেবীভক্ত রাজা প্রিয়ব্রতর মৃত সন্তানের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে দেবী দেবসনা তথা ষষ্ঠী বলেন, মর্ত্যের সর্বত্র তাঁর পুজোর প্রচলন করলেই তিনি এই ছেলেকে ফেরত দেবেন। অন্যথায় একে নিয়ে যাবেন তিনি। রাজি হন রাজা। সারাদেশে প্রচলন করলেন দেবী ষষ্ঠীর পুজো। ফিরে পেলেন পুত্রকেও।

ব্রতকথা :

অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথায় কিছু প্রকার ভেদ থাকলেও মূল কাহিনি প্রায় এক। তাতে আছে : বাড়ির ছোটো বউয়ের নোলা ছিল একটু বেশি। সুযোগ পেলেই সব খাবার খেয়ে দোষ দিত বেড়ালের। মা ষষ্ঠীর বাহন নানা ভাবে লাঞ্ছিত হতো এই কারণে। লাঞ্ছনা সইতে না পেরে বেড়াল একদিন সব বলে দেবী ষষ্ঠীকে। ক্রুদ্ধ হন দেবী। তাঁর ক্রোধে সেই বধূর সন্তান জন্মের পরপরই মারা যেতে থাকে। সপ্তম পুত্রটিও মারা গেলে বিতাড়িত করা হয় বধূকে। বধূটি বনে গিয়ে কাঁদতে থাকে। তার সেই কান্নায় দয়া হয় দেবীর। বৃদ্ধারূপে এসে বলেন, চুরি করে খেয়ে ষষ্ঠীর বাহন বিড়ালকে দোষ দেওয়ার জন্যই এমনটি হচ্ছে। এখন বেড়ালের কাছে ক্ষমা চেয়ে বনে দেবী ষষ্ঠীর পুজো করলেই সে ফিরে পাবে সব। দেবীর কথামতো কাজ করল বউটি। ফিরে পেলে তার মৃত সাতটি ছেলেকেই।

বলা হয় বউটি মা ষষ্ঠীর পুজো করেছিল জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীতে। আর তারপর থেকেই চালু হয়েছে অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীর।

দেবী ষষ্ঠীর সঙ্গে জৈন দেবী নৈসমেসার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনিও এইরকমই শিশুরক্ষাকারী মঙ্গলময়ী দেবী। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধদেবী হারিতীর কথাও বলা হয়। কিন্তু দাহিনী যক্ষিণী ভয়ংকরী। তিনি কখনও শিশু কল্যাণকারী নন।

শেষ কথা :

এত কথা, এত রঙ্গভরা জামাইষষ্ঠী যেন তপ্ত দুপুরে জলভরা এক টুকরো মেঘ। অনেক কিছু হারানোর মরুভূমিতে যেন চেরাপুঞ্জির আকাশ। ভালোবাসার এক সবুজ বাগান। মায়ের আশিস-মাখা পাখার হাওয়ায় নিজেকে ফিরে পাওয়া। পারিবারিক বন্ধনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ জামাইষষ্ঠী, তাই তো বঙ্গজীবনের এক আনন্দঘন অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠান।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম মানবী বোমার উদ্ভাবক বীরাঙ্গনা ভেলু নাচিয়ার

উত্তম মণ্ডল

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের বীরাঙ্গনাদের লড়াইয়ের ইতিহাস থেমে গেছে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের কাছে এসে। কিন্তু রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রায় ৭৭ বছর আগে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম মানবী বোমা ব্যবহার করে যুদ্ধে জিতে নিজের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা রাজ্যের রানি ভেলু নাচিয়ার। এ ইতিহাস আমরা ক'জন জানি? রানির বাল্যজীবন দিয়েই তাহলে শুরু করা যাক। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত রামনাথপুরমের রাজকুমারী ছিলেন ভেলু নাচিয়ার। পিতা চেল্লামুথু বিজয়রঘুনাথ সেতুপতি। মা মুথথাল নাচিয়ার। তাঁদের একমাত্র কন্যাসন্তান এই ভেলু। পরিবারের একমাত্র সন্তান বলে ভেলুকে বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি দেওয়া হয় অস্ত্রশিক্ষাও। মাতৃভাষা ছাড়াও ফরাসি, উর্দু ও ইংরেজিতে ছিলেন যেমন দক্ষ, তেমনি লাঠি চালনা, ঘোড়ায় চড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হয়ে ওঠেন ভেলু।

ইংরেজি ১৭৩০ সালের ৩ জানুয়ারি তামিলনাড়ুর রামনাথপুরমে ভেলুর জন্ম। তিনি ছিলেন শৈবধর্মে বিশ্বাসী। ১৬ বছর বয়সে তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গার রাজা মুথু ভাদুগণথা পেরিয়াভুদয়া থেবরের (১৭৪৬-১৭৭২ খ্রি:) সঙ্গে ভেলুর বিয়ে হয়। তাঁদের একমাত্র কন্যা ভেলাচ্চি। এছাড়াও রানি ভেলুর আরও দু'জন পালিতা কন্যা ছিলেন— কুইলি ও উদাইয়াল। এই কুইলি হয়েছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত প্রথম মানবী বোমা এবং অন্যদিকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিলেন উদাইয়াল। পরে রানি ভেলু নাচিয়ার উদাইয়ালের স্মরণে গড়ে তুলেছিলেন 'উদাইয়াল বাহিনী।' রানি ভেলু নাচিয়ারের সঙ্গে ব্রিটিশের বিরোধ শুরু ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে অর্কটের নবাবের সহায়তায় শিবগঙ্গা আক্রমণ করে ব্রিটিশ এবং কলইয়ারের যুদ্ধে ব্রিটিশ কর্নেল স্মিথের হাতে নিহত হন শিবগঙ্গার রাজা মুথু ভাদুগণথা পেরিয়াভুদাইয়া থেবর। ওই যুদ্ধে স্ত্রী ও শিশুদেরও হত্যা করা হয়েছিল। রানি তখন ছিলেন কোল্লানগুড়িতে। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে চলে গেলেন দিন্দিগুলের কাছে তিরুপাচিতে। সেখানে কোপলা নয়ক্কারের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছিলেন আট বছর।

এই সময় রানি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন এক যোদ্ধাবাহিনী। দেখা করেন মহীশূরের সুতলান হায়দার আলির সঙ্গে। রানির মুখে চোস্ত উর্দু শুনে মুগ্ধ হায়দার আলি তাঁকে দেন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। এরজন্য বিরুপাক্ষ কিংবা দিন্দুগাল দুর্গে রানির মর্যাদায় থাকার পরামর্শ দিলেন হায়দার। দিন্দুগাল দুর্গে রানির মর্যাদায় ছিলেন ভেলু নাচিয়ার। হায়দার প্রতি মাসে খরচের জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন চারশো পাউন্ড সোনা। এছাড়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও সাহায্য করেন রানিকে। অবশেষে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন রানি ভেলু নাচিয়ার।

রানি খোঁজ পেলেন ব্রিটিশের অস্ত্রভাণ্ডারের। ঠিক হলো মানবী বোমা দিয়ে ধ্বংস করা হবে ব্রিটিশের অস্ত্রভাণ্ডার। সেই মতো রানির পালিতা কন্যা তথা মহিলা কমান্ডার কুইলি হলেন সেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম মানবী বোমা। সারা গায়ে তেল-ঘি মেখে আগুন জ্বালিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ব্রিটিশের অস্ত্রভাণ্ডারে। কুইলির আত্মবলিদানের বিনিময়ে ধ্বংস হয়ে গেল অস্ত্রভাণ্ডার। অগ্নিগ্রাসে হারিয়ে গেলেন মানবী বোমা কুইলি। তাঁকে দেওয়া হয় 'ভিবামাঙ্গাই' অর্থাৎ বীরাঙ্গনা খেতাব। এদিকে সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ সৈন্যের ওপর জোর আঘাত হানতে লাগলেন রানি। ছিনিয়ে আনলেন নিজের রাজ্য। রানি ভেলু নাচিয়ার একমাত্র বীরাঙ্গনা, যিনি ব্রিটিশের হাত থেকে প্রথম নিজের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এরপর দশ বছর নিজের রাজ্য শালন করে একমাত্র কন্যা ভেলাচ্চিকে উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করে অবসর নেন তিনি ভেলু নাচিয়ার। হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন রানি। চিকিৎসা হয়েছিল ফ্রান্সে। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর ৬৬ বছর বয়সে মারা গেলেন রানি ভেলু নাচিয়ার। হায়দার আলির সাহায্যের কথা ভোলেননি তিনি। তাঁর স্মৃতিতে তৈরি করে দেন মসজিদ। অন্যদিকে, হায়দার আলিও রানির জন্য নিজের প্রাসাদে তৈরি করে দেন মন্দির। পরবর্তীকালে হায়দার-পুত্র টিপু সুলতানের সঙ্গেও সুসম্পর্ক ছিল রানির। টিপুকে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের স্ট্যাচু উপহার দেন রনি ভেলু নাচিয়ার। রানির স্মরণে ভারত সরকার ইংরেজি ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। ভারতের ইতিহাসে এখনো অনেকটাই অপরিচিতা এই বীরাঙ্গনা রানি ভেলু নাচিয়ার। □

পানিহাটির দণ্ড মহোৎসব

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর চব্বিশ পরগনার গঙ্গা তীরবর্তী এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ পানিহাটি। কারও মতে, 'পুণ্যহট্ট' বা 'পণ্যহট্ট' নাম থেকেই 'পানিহাটি' কথাটি এসেছে। একদা গঙ্গা তীরবর্তী এই অঞ্চলে পণ্য আমদানি রপ্তানি হতো বলেই 'পণ্যহট্ট' নামটি প্রচলিত ছিল। এই জনপদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতিকে বহন করে চলেছে।

পুরী যাওয়ার পথে এবং পুরী থেকে গৌড় যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পানিহাটি গঙ্গার ঘাটে অবতরণ করেছিলেন। তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল পানিহাটি। গঙ্গার তীরে সেই ঘাটটি 'শ্রীচৈতন্য ঘাট' নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত। শোনা যায়, ১১০২ বঙ্গাব্দে রাজা বল্লাল সেন এই ঘাট তৈরি করেছিলেন। ঘাটের ঠিক উপরেই আছে এক প্রাচীন বটবৃক্ষ। কথিত আছে, এই বটবৃক্ষের নীচেই চৈতন্যদেব ও প্রভু নিত্যানন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন।

পানিহাটিতে কয়েকদিন অবস্থান করার পরে নীলাচলে যাওয়ার আগে চৈতন্যদেব প্রভু নিত্যানন্দকে দক্ষিণবঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে যান। সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে নিত্যানন্দ একদিন নৌকাযোগে গঙ্গাতীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে নামকীর্তন করতে করতে পানিহাটির 'শ্রীচৈতন্য ঘাট'-এ নামলেন। সেই সময় সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য মজুমদারের ভক্তিপ্রাণ ভাইপো রঘুনাথ মজুমদার ওই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করার জন্য রঘুনাথ ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানান। সেই সঙ্গে রঘুনাথ সবিনয়ে বলেন, এত দেরি করে কৃপাপ্রার্থী হতে এসেছেন বলে নিজেকে অপরাধী মনে করছেন। তাই তিনি নিত্যানন্দের কাছে এই স্বকৃত অপরাধের জন্য দণ্ড বা শাস্তি প্রার্থনা করেন। বিনয়ী রঘুনাথের মুখে একথা শুনে নিত্যানন্দ তাঁকে দু'হাত বাড়িয়ে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'তোমার মতো বিনয়ী বৈষ্ণবের বৈষ্ণব সেবাই দণ্ড। এখানে উপস্থিত বৈষ্ণবদের দই-চিড়ে দিয়ে মহোৎসব করাও। আমি তোমাকে এই দণ্ডই দিলাম'। সেই শুভদিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সেদিন নিত্যানন্দের আদেশে রঘুনাথ সানন্দে চিড়ে, দই, কলা, দুধ, চিনি প্রভৃতি সংগ্রহ করে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে ভোজন করিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। এই উৎসবই বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে 'দণ্ড মহোৎসব' নামে পরিচিত। উৎসবান্তে নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে আশীর্বাদ করে বলেন, 'অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ।'

তদবধি রঘুনাথ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে বৈষ্ণব ও ভক্তের সমন্বয়ে এই মহোৎসবের আয়োজন করতেন। রঘুনাথের পর পানিহাটি নিবাসী রাঘব পণ্ডিত দণ্ড মহোৎসববের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আজও জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটিতে এই উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। দণ্ড মহোৎসবে লক্ষ লক্ষ ভক্তের ঢল নামে।

'শ্রীচৈতন্য ঘাট'-এর উপর দণ্ড মহোৎসববের প্রাঙ্গণটি বাঁধানো। পাশে একটি ছোটো ঘরে চৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন পূজিত হয়। জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম, গৌর, নিতাই ও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহও এখানে রক্ষিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদ বহুবার দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করেছেন। পানিহাটি নিবাসী মণিমাধব সেনের কাছে তিনি প্রথম এই উৎসবের বিষয়ে জ্ঞাত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করতে পানিহাটিতে প্রথম আসেন ইংরেজি ১৮৬৮ সালে। ১৮৮৫ সালে অসুস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবার এসেছিলেন পানিহাটির মহোৎসবে। এই উ'সবে উপস্থিত থেকে তিনি আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করতেন।

পানিহাটির দণ্ড মহোৎসব বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে এক মহামিলন মেলা। লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণ মাতানো কীর্তনে মেতে ওঠে মহোৎসব প্রাঙ্গণ। বহু বিদেশি ভক্ত দণ্ড মহোৎসবে যোগদান করে উৎসবের কৌলিন্য বৃদ্ধি করেন। অতিমারি পরিস্থিতিজনিত কারণে বিগত দুই বছর (২০২০ ও ২০২১) দণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রশাসন থেকে অনুমতি মেলায় এই বছর দণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২৯ জ্যৈষ্ঠ (১২ জুন ২০২২) রবিবার। □

মাইকে আজান কোনো মৌলিক অধিকার নয় জানিয়ে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট

দুর্গাপদ ঘোষ

শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় ও আইনি দু'দিক থেকেই সিদ্ধ হয়ে গেছে যে মসজিদ থেকে ধ্বনিবর্ধক যন্ত্রের মাধ্যমেই আজান দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ বছর রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রার ওপরে দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরী-সহ দেশের অনেক জায়গায় এমনকী মসজিদ থেকেও পাথরবাজি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সারা দেশের নানা জায়গায় ভোররাতে মসজিদগুলো থেকে লাউডস্পিকারে কান ফাটানো আওয়াজে আজান দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন বহু মানুষ। এমনকী রাজনৈতিক নেতারাও বাদ নেই। অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে এইভাবে আজান দেওয়া হলে পালটা ব্যবস্থা হিসাবে তাঁরাও মসজিদের সামনে মাইক বাজিয়ে হনুমান চালিশা বা হনুমান বন্দনার ৪০টা দোহা (পদ) পাঠ করবেন কিংবা রেকর্ড বাজাবেন ঘোষণা করে অনেক জায়গায় তা করেওছেন। এ ব্যাপারে সারা দেশ প্রায় তোলপাড় করে দিয়েছেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস) সুপ্রিমো রাজ ঠাকরে।

গত ১ রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদে তাঁর ডাকা জনসভায় যেরকম বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সাধারণ মানুষ মাত্রাছাড়া শব্দ দূষণে যৎপরোনাস্তি তিতিবিরক্ত। তারা এসব আর বরদাস্ত করতে রাজি নয়। অন্যদিকে ছটফটানি শুরু হয়েছে অনেক রাজনৈতিক দলের মধ্যে। বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন মহা আগাড়ি সরকারের আচরণে। শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরে এক সময় দুটো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। একটা হলো, অমরনাথ যাত্রীদের ওপর ইসলামি জঙ্গি হামলা হলে তাঁরা মুম্বাই থেকে কাউকে হজযাত্রায় যেতে দেবেন না বলে হুমকি। যে হুমকির পর অনেকদিন পর্যন্ত অমরনাথ যাত্রীদের ওপর উল্লেখযোগ্য জঙ্গি হামলা হয়নি। অন্যটা হলো, বাল ঠাকরে প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'মসজিদ থেকে এইভাবে লাউডস্পিকারে আজান দেওয়া হলে সমস্ত মসজিদ থেকে জোর করে মাইক নামিয়ে দেওয়া হবে।' এখন তাঁর ছেলের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা কংগ্রেস এবং শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রবাদী কংগ্রেস পার্টি (এসিপি)-র জোট সরকার এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরের বিরুদ্ধে মহাবিক্রমে মাঠে নেমে পড়েছে। রাজ ঠাকরে যিনি উদ্ধবের জ্যেঠতুতো দাদাও বটে, উদ্ধব সরকার তাঁকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট জারি করতেও দ্বিধা করেনি।

তার আগে উদ্ধবের বাসস্থান 'মাতোশ্রী'-র সামনে গত ২৪ এপ্রিল শান্তিপূর্ণভাবে হনুমান

চালিশা পাঠ করার 'অপরাধে' লোকসভায় নির্বাচিত একজন নির্দল সাংসদ নবনীত রানা এবং তাঁর বিধায়ক স্বামী রবি রানাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেওয়া হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ-র মামলা পর্যন্ত দায়ের করেছে ঠাকরে প্রশাসন। একটানা ১১ দিন জেলে কাটাবার পর মুম্বাইয়ের এক আদালতে শর্তসাপেক্ষে জমিনে তাঁরা জেলের বাইরে আসতে পেরেছেন। তার পরও শিবসেনার নেতারা বুক বাজিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন যে তাঁদের কেউ যেন হিন্দুত্ব শেখাতে না আসে। ক্ষমতার রাজনীতি কোথায় পৌঁছতে পারে এবং এসবের পেছনে কাদের হাত কাজ করছে সাধারণ বুদ্ধির মানুষদেরও তা বুঝতে বাকি নেই। তবে রাজ ঠাকরের দল উদ্ধব সরকারের হুমকির কাছে মাথা নত না করে ৪ মে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় মাইকে আজানের প্রতিবাদে পালটা হনুমান চালিশা বাজাতে পিছপা হয়নি। ৫ মে রাজ ঠাকরে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অভিযোগ করেন যে উদ্ধব সরকার এজন্য তাঁর দলের প্রায় ২০ হাজার কর্মী ও সমর্থককে আটক করেছে।

তবে প্রশাসনের তরফে ১৬৫ জন এমএনএস কর্মীকে গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়। রাজ ঠাকরের স্পষ্ট বক্তব্য, মাইকে আজানের বিরোধিতা কোনো ধর্মীয় বিষয় নয়। সম্পূর্ণ সামাজিক তথা জাতীয় স্বার্থের আন্দোলন। এ আন্দোলন একদিনের আন্দোলন নয় বলেও জানিয়েছেন রাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত মাইকে আজান বন্ধ না হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মসজিদ থেকে লাউডস্পিকার অপসারণ না করা হবে ততক্ষণ তাঁর এই আন্দোলন বহাল থাকবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। কেবল রাজ ঠাকরে ও মহারাষ্ট্র নয়, দেশের আরও বহু জায়গায় মাইকে আজান-বিরোধিতা ইতিমধ্যে প্রায় জন-আন্দোলনের রূপ নিতে দেখা গেছে।

রাজ ঠাকরের বক্তব্য যে নিতান্ত অসার নয় নানা দিক থেকে তা একরকম প্রস্থাপিত হচ্ছে। জানা যাচ্ছে যে মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারের মাধ্যমেই আজান দিতে হবে এটা ইসলামের অনিবার্য বিধান নয়। তীব্র আওয়াজে আজান কিংবা অন্যান্য আচরণ মানুষের শারীরিক তথা সামাজিক অর্থাৎ জাতীয় সমস্যা। তা না হলে উত্তরপ্রদেশ-সহ দেশের অনেক রাজ্যে এমনকী মহারাষ্ট্রেও রাতারাতি বহু মসজিদ পরিচালক নিজেরাই লাউড স্পিকার সরিয়ে দিতেন না বা আওয়াজ কমিয়ে ফেলতেন না।

এ বছর ইদ উদ্‌যাপন হয় গত ৩ মে। তার কয়েকদিন আগে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে রাজ্যে ২ মে-র মধ্যে বহু মসজিদ থেকে মোট ৫৪ হাজার ৩৩২টা লাউড স্পিকার সরিয়ে দেন মসজিদ কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ৬০ হাজার ৯৬৩টা লাউড স্পিকারের আওয়াজ ৬০ ডেসিবল-এর নীচে নামিয়ে দেয় মসজিদগুলো। কই, তাতে তো আজানে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। ২৪ কোটি জনসংখ্যার ওই রাজ্যে যেখানে ১৮ শতাংশের মতো মুসলমান রয়েছেন সেখনে কেবলমাত্র ৬১টি মসজিদ থেকে লাউড স্পিকার সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ প্রসাসন। লাউড স্পিকার সরানো কিংবা আওয়াজ কমানো নিয়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ঘটেনি কোথাও কোনো পেশি আস্ফালনের ঘটনা। শান্তিপূর্ণভাবে ইদ পালিত হয়েছে। সরকারি নির্দেশ মেনে রাজ্যের কোথাও রাস্তা আটকে নমাজ পাঠ হয়নি। এসব যদি ইসলাম বিরোধী হতো তাহলে মুসলমান সমাজ নিশ্চয় তা নির্বিবাদে মেনে নিতেন না। নিদেনপক্ষে আদলতের দ্বারস্থ হতেন।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি কয়েকটা রাজ্যে উলটো চিত্র দেখতে পাওয়া গেছে। এই সমস্ত রাজ্যে অনেক জায়গাতেই সকাল ৬টার আগে তীক্ষ্ণ আওয়াজে যেমন আজান দেওয়া হয়েছে তেমনি রাজ্য সরকারগুলো ইদের দিন রাস্তার ওপর জমায়েত ও নমাজ পাঠের অনুমতি দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রীরাও তাতে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে রাজস্থানে কংগ্রেসের অশোক গেহলত এবং পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) সরকার।

কাকভেরে মসজিদ থেকে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে চড়া আওয়াজে আজান দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হওয়া কোনো নতুন ঘটনা নয়। এ নিয়ে আদালতে মামলা মোকদ্দমাও কিছু কম হয়নি। কয়েক দশক আগে পশ্চিমবঙ্গে এ নিয়ে তীব্র শোরগোল উঠেছিল। তখন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট সরকার। মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ালে বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জির এজলাশ এক নির্দেশে রায় দিয়েছিলেন যে শব্দদূষণ ঠেকাতে লাউড স্পিকারে শব্দের তীব্রতা যেন ৬০ ডেসিবলের বেশি না হয়।

তাছাড়া কেবল আজান নয়, যে কোনো কার্যক্রম এমনকী নির্বাচনী প্রচারেও রাত ১০টার পরে আর মাইক বাজনো যাবে না বলেও রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি ব্যানার্জি। তখন ধর্মের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে এক শ্রেণীর তথাকথিত উদারবাদী বিশিষ্ট-রা যুথবদ্ধভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁদের গলাবাজি এতটাই উচ্চগ্রামে উঠেছিল যে মাপলে হয়তো ১২০ ডেবিবল ছাড়িয়ে যেত। তারপর থেকে বেশ কিছুদিন লাউড স্পিকারে কম শব্দে আজান বিশেষ করে কজর বা ভোরবেলার আজান এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান, গান-বাজনার জলসা-মজলিশেও রাত ১০টার পর মাইক বাজানো বন্ধ রাখা হচ্ছিল।

কালক্রমে আবার আগের অবস্থা ফিরে এসেছে। ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কেউ তার প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু তোষামোদের রাজনীতির দাপটে সেসব ধোপে টেকেনি। তাছাড়া অতিষ্ঠ হয়ে যাঁরা প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা কেউ তেমন বিশিষ্ট ছিলেন না বলে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। কিন্তু বছর খানেক আগে মাইকে আজান নিয়ে ফের শোরগোল পড়ে যায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিবাদের ফলে। তিনি হলেন বিখ্যাত গায়ক তথা বলিউডের নামকরা প্লেব্যাক সিঙ্গার সোনু নিগম। তবে তাঁর প্রতিবাদেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। কারণ হয়তো এটাই ছিল যে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে স্বর চড়িয়েছিলেন তাঁরা হয়তো সোনু নিগমের চাইতে আরও অনেক বেশি বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী ছিলেন।

এবার রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রার ওপর দেশের অনেক জায়গায় সাম্প্রদায়িক হামলা হবার পর বিশেষভাবে হিন্দুত্ববাদী হিসেবে পরিচিত তথা প্রয়াত বাল ঠাকরের ভাইপো এবং মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার প্রতিষ্ঠাতা-নেতা রাজ ঠাকরে রাস্তায় নামার ফলে সমস্ত ধর্মস্থান থেকে বেআইনি তথা সরকারের অননুমোদিত লাউড স্পিকার হটিয়ে দেওয়ার দাবি প্রবল আকার ধারণ করে। বেশিরভাগ মন্দির তা নির্বিবাদে মেনে নিলেও মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারে আজান দেওয়াকে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও মৌলিক অধিকার বলে দাবি করা হয়েছে ও হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালে মাইকে আজান দেওয়ার অধিকার সম্পর্কিত এক নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেন সে রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত লাউড স্পিকারে আজান দেওয়া যাবে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে কখনো কখনো, কোথাও কোথাও রাত সাড়ে তিনটে-চারটের সময়ও জোরালো আওয়াজে আজান দেওয়া হয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত গুয়াহাটিতে থেকে সাংবাদিকতা করার সময় এই প্রতিবেদকের এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।

রাজ ঠাকরে এবং সাংসদ নবনীত রানাদের প্রতিবাদ এবং হনুমান চালিশা পাঠের প্রতিক্রিয়ায় মাঠে নামে শিবসেনা। বরাবর একনিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে পরিচিত শিবসেনা মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস এবং এনসিপি-কে নিয়ে সরকার গড়ার পর থেকে তাদের মতিগতি অন্যরকম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লাউড্ড স্পিকার সরানোর প্রশ্নে গত ২ মে শিবসেনা মুখপাত্র তথা দলের দৈনিক মুখপত্র 'সামনা'-র সম্পাদক সঞ্জয় রাউত রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান যে মহারাষ্ট্রে কোথাও কোনো বেআইনি লাউড স্পিকার নেই এবং কোথাও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে মাইকে আজান দেওয়া হয় না। অথচ রাজ ঠাকরের বক্তব্য ছিল কেবল মুম্বাইয়েই ১৩৫টা মসজিদ থেকে সকাল ৬টার আগে নির্দেশ লঙ্ঘন করে তীব্র আওয়াজে আজান দেওয়া হচ্ছে। ৭ মে-র খবর হলো খোদ মুম্বাই মহানগর পুলিশ অন্তত দুটি মসজিদ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করে।

কারণ ওই দুই মসজিদে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে সকাল ৬টার আগে লাউড স্পিকারে আজান দেওয়া হচ্ছিল। অভিযুক্তদের একজন হলেন বান্দ্রা (পশ্চিম)-র নূরানি মসজিদের মহম্মদ সাবির শাহ। অন্য দুজন হলেন সান্তাক্রুজ (পশ্চিম)-এ 'মুসলিম কবরস্থান মসজিদ'-এর মহম্মদ সোয়েব আকতার শেখ ও আরিফ মহম্মদ সিদ্দিকি। অর্থাৎ অন্তত উল্লেখিত দুই মসজিদে বেআইনি ভাবে লাউড স্পিকারে আজান দেওয়া হচ্ছিল। তাহলে আইনি বেআইনি প্রশ্নে রাউতের ওই বিবৃতি কতটা সত্যি? ক্ষমতার মোহে শিবসেনার মতো দলও কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? তবে ঘটনা হলো, আজান বিতর্কে হিন্দু সমাজ জোটবদ্ধ হবার পর থেকে অন্তত এখন পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ ও

> "আজান ইসলামের একাত্ম বিষয় হলেও তা লাউড স্পিকারের মাধ্যমে দেওয়াটা অনিবার্য বা অবধারিত নয়। তা সত্ত্বেও অনেকে সেই লাউড স্পিকারে আজানের দাবিতে গোঁ ধরে রেখেছেন। যার ফলে বৃহত্তর ও বহুত্ববাদী সমাজে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যা মোটেই কাম্য নয়।"

মহারাষ্ট্র-সহ অনেক রাজ্যে মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মস্থান থেকে হয় লাউড স্পিকার সরিয়ে নেওয়া অথবা আওয়াজ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সকাল ৬ টার আগে বহু জায়গায় মাইকে আজান দেওয়া হচ্ছে না।

সংগীত শিল্পী সোনু নিগম ছাড়াও ২০২১ সালে আরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সঙ্গীতা শ্রীবাস্তব প্রয়াগরাজ জেলাশাসক ভানচন্দ্র গোস্বামীর কাছে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। তাতে বলেছিলেন যে তাঁর বাসস্থানের কাছে, এলাহাবাদ সিভিল লাইন্স-এর এক মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারে তীব্র আওয়াজে আজান দেওয়ার কারণে তাঁর ঘুম এবং ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে কাজকর্ম করায় প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। সে বছরের ১৬ মার্চের ওই অভিযোগপত্রে উপাচার্য আরও জানান যে এতে তাঁর মাথার যন্ত্রণা-সহ শারীরিক ক্ষতিও হচ্ছে। অভিযোগপত্রের অনুলিপি ডিসি, আইজি এবং এসএসপি-র কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীমতী শ্রীবাস্তব। উল্লেখিত ওই চিঠিতে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে আফজল আনসারি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা (পিআইএল) নং ৫৭০ (২০২০)-এর উদাহরণও তুলে ধরেন। দাবি করেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার। ওই চিঠি পেয়েই রাজ্য প্রশাসন তৎপর হয়ে ওঠে এবং পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের এক যৌথ টিমকে সরেজমিনে তদন্ত করতে পাঠানো হয়। তাঁরা মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টা তুলে ধরতেই তাঁরা লাউড স্পিকারের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন। এই ঘটনার সপ্তাহখানেকের মধ্যে ২৩ মার্চ প্রথম যোগী সরকারের গ্রামোন্নয়ন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনন্দস্বরূপ শুক্ল রাজ্যের বালিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এক চিঠি লিখে স্থানীয় মদিনা মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারে আজানে শব্দের মাত্রা কমানো এবং অতিরিক্ত লাউড স্পিকার হটিয়ে দিতে বলেন। তৎকালীন মন্ত্রী তাঁর ওই অভিযোগপত্রে জানিয়েছিলেন যে, মাইকের মাধ্যমে সারাদিনে পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেওয়ার কারণে কাছাকছি অন্তত

তিনটে স্কুলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। আরও অভিযোগ করেছিলেন যে কেবল আজান দেওয়া নয়, প্রায় সারাদিন ধরে ওই মসজিদের জন্য অর্থদান এবং অন্যান্য বিষয়েও লাউড স্পিকারের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। চিঠি দিয়ে অভিযোগ করা ছাড়াও জোরালো আওয়াজে আজান এবং অন্যান্য বার্তার ভিডিয়ো করে মন্ত্রী তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন।

গত ১১ মে বেঙ্গালুরুতে মাইকে আজান দেওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন বহু হিন্দু। তার আগে সেদিন ভোরবেলা বেশ কয়েকটা মন্দিরে মাইকের মাধ্যমে হনুমান চালিশা পাঠ এবং ভজন-কীর্তন করে প্রতিবাদ শুরু করা হয়। দলবদ্ধভাবে তাঁরা জানিয়ে দেন যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো মসজিদ থেকে তীব্র আওয়াজে আজান দেওয়া বন্ধ না হলে তাঁরাও এইভাবে নিয়মিত মাইক বাজিয়ে যাবেন। ফলে কালবিলম্ব না করে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র জানান যে রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত যাতে মাইক না বাজে তা নিশ্চিত করা হবে। কোথাও বিনা অনুমতিতে লাউড স্পিকার লাগানো বা বাজানো হচ্ছে কিনা সেদিকে কঠোরভাবে নজর রাখা হবে বলেও জানান তিনি। সেদিনই রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী আনন্দ সিংহ বলেন যে লাউড স্পিকারে অনুমোদিত মাত্রার বেশি আওয়াজ করা হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে কসুর করবে না কর্ণাটকের বিজেপি সরকার। এদিকে ১৪ মে দিল্লির এক হনুমান মন্দিরে গিয়ে সতীর্থদের নিয়ে হনুমান চালিশা পাঠ করেন লোকসভার সদস্য নবনীত রানা। সেখানে অন্যান্যদের মধ্যে তাঁর স্বামী রবি রানাও ছিলেন।

মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে আজান দেওয়া যে আইনি তথা মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না গত ৬ মে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। উত্তরপ্রদেশের বদায়ুন জেলার জনৈক ইরফানের এক আবেদন খারিজ করে দিয়ে এই মর্মে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এই উচ্চ আদালতের দুই বিচারপতি বিবেক কুমার বিড়লা এবং বিচারপতি বিকাশ বুধওয়ার-এর এক ডিভিশন বেঞ্চ। নূর মসজিদ নামে জেলার এক মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারে আজান দেবার অধিকার চেয়ে উচ্চ আদালতে আবেদন করেছিলেন ইরফান। হাইকোর্ট পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিয়ে বলেন, 'এটা কোনো মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না।' অর্থাৎ কিনা এটা আইনসিদ্ধ নয়।

প্রসঙ্গত, কর্ণবিদারি আওয়াজ এবং শব্দদূষণ প্রশ্নে দেশজুড়ে ধর্মস্থান থেকে লাউড স্পিকার হঠানো নিয়ে যখন ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে তখন কয়েকজন ঐতিহাসিক এবং ইসলামি তাত্ত্বিকের কিছু বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে গত ২৮ এপ্রিল। তাঁদের বক্তব্যের সার কথা হলো, এক সময় মসজিদের মিনার থেকে 'মুআজ্জিন' বা আজান দাতারা নমাজিদের ডাকার জন্য আজান দিতেন। কিন্তু এখন মিনারগুলো বস্তুত প্রতীকী স্থাপত্য তথা দর্শনীয় বস্তু। তাঁরা বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এক সময় মিনারগুলো মসজিদের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বিশেষ করে শহরগুলোতে যেখানে প্রচুর জনবসতি থাকে। নমাজিরা যাতে আজানের মাধ্যমে নমাজ আদা করার ডাক শুনতে পান সেজন্য মুআজ্জিনরা ওপরে উঠে মিনার থেকে আজান দিতেন। যাতে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত তা শুনতে পাওয়া যায় এবং নমাজিরা বুঝতে পারেন যে নমাজ পাঠের সময় হয়েছে। কোনো মসজিদে মিনার না থাকলে মুআজ্জিনরা অন্য কোনো উঁচু জায়গা থেকে আজান দিতেন।

কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং যানবাহনাদির কোলাহলের কারণে লাউড স্পিকার লাগানো শুরু হয়। এই বক্তব্য যাঁরা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ঈশ্বরশরণ ডিগ্রি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক জামিন আহমেদ। তাঁর মতে 'এখন মিনারগুলো নির্মিত হচ্ছে প্রথাগত স্থাপত্য হিসাবে।' পাশাপাশি প্রয়াগরাজ জেলার ধুমনগঞ্জের অধিবাসী সাহানুদ্দিন যিনি ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তাঁর বক্তব্য, 'মসজিদে লাউড স্পিকারের ব্যবহার শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে। কিন্তু এখন কোনো বড়ো মসজিদের মুআজ্জিনরা মাইক ছাড়া আজান দেন না।' এছাড়া নাগপুরে আহ্‌লে-সুন্নত ওয়াল জামাত-এর সঙ্গে যুক্ত একজন সমাজকর্মী এবং ইসলামি তাত্ত্বিক নাদিম শেখের বক্তব্যও প্রায় একইরকম। বারাণসী থেকে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর এক ইংরেজি দৈনিকে গত ২৯ এপ্রিল ও ২ মে এদের এই বক্তব্য প্রকাশিতও হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তির বক্তব্য থেকেও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, আজান ইসলামের একাত্ম বিষয় হলেও তা লাউড স্পিকারের মাধ্যমে দেওয়াটা অনিবার্য বা অবধারিত নয়। তা সত্ত্বেও অনেকে সেই লাউড স্পিকারে আজানের দাবিতে গোঁ ধরে রেখেছেন। যার ফলে বৃহত্তর ও বহুত্ববাদী সমাজে একটা অতি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যা মোটেই কাম্য নয়।

লাউড স্পিকারের আজান, বিশেষ করে ভোররাত্রের আজান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা জায়গায় নানা ব্যক্তি প্রবল আপত্তি করে আসছিলেন। কিন্তু তোষামুদে রাজনীতির পৃষ্ঠপোষণায় এতদিন তা কেউ তেমন ভাবে কানে তোলেননি। ফলে ভেতরে ভেতরে ক্ষোভের বারুদ জমা হচ্ছিল। এবার রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রার ওপর মসজিদ ও অন্যান্য জায়গা থেকে হামলার ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই বারুদে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে সারা দেশের সমস্ত রাজ্য সরকার তথা প্রশাসনের উচিত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ যাতে যথাযথ ও কঠোর ভাবে পালিত হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকার যদি পারে তাহলে অন্যান্য রাজ্য সরকার পারবে না কেন! রাজনীতির স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত রাজ্য সরকারেরই যোগী সরকারকে অনুসরণ করা উচিত। সমাজে কোনো সাম্প্রদায়িক বিপত্তি ঘটুক এটা নিঃসন্দেহে কারও কাম্য নয়। বলা বাহুল্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমাজ কারও গোঁ ধরে থাকা কিংবা কারও পেশি আস্ফালনের জায়গা নয়।

স্টক পাখির উদ্ধারে নব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোনও পাখিকেই অশুভ বলা উচিত নয়। তবুও আমরা বেশ কয়েকটি পাখিকেই অশুভ বলে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করি। এরকম অশুভ মনে করে মেরে ফেলা হচ্ছে লম্বা পায়ের, সারসের মতো দেখতে, মৎস্যপ্রিয় দ্য গ্রেটার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক (লেপ্টোপ্টিলোস ড্যুবিয়াস) নামক সারস-জাতীয় পাখিটিকে। তবে, এই পাখিটিকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এসেছেন অসম ও বিহারের বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েকজন পরিবেশপ্রেমী ও মানুষজন। এঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে স্টর্ক পাখিদের বাসস্থান ও ডিম-শাবককে।

দ্য গ্রেটার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক পাখিকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এসেছেন অসমের গুয়াহাটির বাসিন্দা পূর্ণিমা দেবী বর্মন এবং বিহারের ভাগলপুর জেলার অরবিন্দ মিশ্র নামে দুই জীববিজ্ঞানী। তাঁদের উদ্যোগে গ্রামবাসীরা আর এই স্টর্ক পাখিকে অশুভ পাখি বলে মনে করেন না। একসময় উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতে অনেক বেশি সংখ্যায় পাওয়া যেত স্টর্ক পাখি। তবে, চোরা শিকারের জন্য পাখিটার বসতি এখন কমে এসে অসম ও বিহারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কাম্বোডিয়াতেও গ্রেটার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক পাখিটি পাওয়া যায়। তবে, বর্তমানে পাখিটার সংখ্যা মাত্র ১২০০-তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই স্টর্ক পাখি অন্যান্য সব আবর্জনার পাশাপাশি বিভিন্ন মৃতদেহের মাংসও খেয়ে থাকে। আর সেই জন্যই অসমের দাদারা গ্রামে অনেক স্টর্ক পাখিকে 'মৃত্যুদূত' আখ্যা দিয়ে মেরে ফেলে হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাণীবিজ্ঞানীরা। আমাদের পরিচিত হাড়গিলে পাখির সঙ্গেও মিল আছে এই স্টর্ক পাখির। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এরা নাকি মৃতদেহের অংশবিশেষ, ঘর-বাড়ি আর মানুষের ওপর ফেলে। তাই, পাথর ও লাঠির আঘাতে অনেক গ্লামবাসীই স্টর্ক পাখিকে হত্যা করে থাকেন।

দ্য গ্রেটার স্টর্ক পাখি নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা শুরু করেছিলেন 'ভারতের পক্ষীমানব' নামে সুবিখ্যাত— ডাঃ সালিম মঈজুদ্দিন আব্দুল আলি। 'দ্য বুক অব ইন্ডিয়ান বার্ডস' বইতে ডাঃ আলি এই পাখিকে ন্যাড়ামাথা, কোদালের মতো ঠোঁটওয়ালা, কালো, সাদা ও ধূসর রঙের পাখি রূপে বর্ণনা করেছেন। আফ্রিকার ম্যারবোন ও পেলিক্যান পাখির মতোই এই স্টর্ক পাখিদেরও ঠোঁটের নীচে খাদ্য জমা করার জন্য থলি আছে। সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট বা হাবিলদারের মতো মাপা পায়ে চলে বলেই এই স্টর্ক পাখির এই ধরনের নাম। চিল ও শকুনি পাখির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মৃতদেহ ও আবর্জনা খেয়ে থাকে এই স্টর্ক পাখিরা। অনেকে আবার বিশ্বাস করে অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক পাখির মাথার মধ্যে নাকি সাপের বিষকে প্রশমিত করার জন্য 'জোহর-মোহরা' নামক একধরনের মণি আছে। এই বিশ্বাসের জন্যও বহু স্টর্ক পাখিকে হত্যা করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। অসমের গ্রামগুলিতে

স্টর্ক পাখি বাঁচানোর জন্য মহিলাদের নিয়ে হাড়গিলা বাহিনী নামক একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন পূর্ণিমা দেবী বর্মন। অসমের কামরূপ জেলায় এই মহিলারা বেশ কিছু গাছ, যেগুলিতে স্টর্ক পাখিরা বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, সেই গাছগুলি কাটা বন্ধ করেছেন। এর জন্য অবশ্য প্রথমদিকে অনেক সমালোচনা ও বাধার সামনে পড়তে হয়েছে তাঁদের। স্টর্ক বা হাড়গিলা পাখির মোটিফ দিয়ে কাপড় বুনে সেই কাপড় বিক্রিও করছেন হাড়গিলা বাহিনীরা মহিলার। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে, স্টর্ক পাখি বাঁচানোর জন্য সচেতনতা গড়েও তুলেছেন পূর্ণিমা দেবী বর্মন ও তাঁর সঙ্গীরা। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টর্ক পাখি জীবনশৈলী নিয়ে পি-এইচডি করেছেন পূর্ণিমা দেবী। অন্যদিকে, বিহারে স্টর্ক পাখি বাঁচানোর জন্য মন্দার নেচার ক্লাব তৈরি করেছেন অরবিন্দ মিশ্র। বাঢ়ওয়া-কোশী নদীর প্লাবন সমভূমিতে স্টর্ক পাখি বাঁচানোর জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন অরবিন্দ এবং তাঁর সতীর্থ জীববিজ্ঞানীরা। বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি থেকে এ ব্যাপারে সাহায্যও পেয়েছে তাঁরা। উল্লেখ্য, এখানে পাখি দেখার প্রথম পাঠ ডাঃ সেলিম আলি নিয়েছিলেন প্রাণীবিজ্ঞানী ওয়াল্টার স্যামুয়েল মিলার্ডের কাছ থেকে। প্রথম দিকে স্টর্ক পাখি উদ্ধার করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছিলেন অরবিন্দ মিশ্রও। অনেকে তাঁকে পুলিশের গুপ্তচর এবং পাখি পাচারকারী হিসেবেও সন্দেহ করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত পাখি রক্ষা করার জন্য আর বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের এই পাখি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে বিহারের ভাগলপুরে একটি তথ্যজ্ঞাপন কেন্দ্রর উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে বিহারে প্রায় ৬০০ টির মতো দ্য গ্রেটার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক পাখি দেখা গেছে। স্টর্ক পাখির বাসার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, তার জন্য দিনরাত্রি বিভিন্ন গাছে, নদী ও পুকুরে নজরদারি করছেন গ্রামবাসীরা। এক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্য করছে বাইনোকুলার, ক্যামেরা ও স্মার্টফোন। স্টর্ক পাখির বাচ্চারা যাতে অসাবধানে বাসা থেকে পড়ে না যায়, তার জন্য গাছের তলায় নাইলন ও মসলিনের নেট লাগানো হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদ-অববাহিকাতে যাতে দ্য গ্রেটার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্কদের সংখ্যা আরও বাড়ে তারও চেষ্টা চালানো হচ্ছে। □

মহাদাতা হরিশ্চন্দ্র

অযোধ্যার রাজা ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। তিনি ছিলেন দয়ার অবতার। একদিন বিশ্বামিত্রের আশ্রমের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি কয়েকটি বালিকার করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলেন। ক্ষত্রিয় বীর তিনি, তাতে আবার দেশের রাজা। নারীর আর্তনাদ শুনে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, কোথাও কেউ নেই। একটি গাছে শুধু পাঁচটি বালিকা লতা দিয়ে বাঁধা। তারাই আর্তনাদ করছিল। রাজা তরবারির দ্বারা লতার বাঁধন কেটে তাদের মুক্ত করে দিলেন।

বিশ্বামিত্র আশ্রমে ফিরে দেখলেন, বালিকাদের কেউ মুক্তি দিয়েছে। ধ্যানবলে তিনি বুঝলেন যে, কাজটি রাজা হরিশ্চন্দ্রের। তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে হরিশ্চন্দ্রের রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। রাজা ঋষিকে বললেন, তুমি কেন আমার আশ্রমে গিয়ে দেব-বালিকাদের বন্ধনমোচন করেছ? ওরা আশ্রমে এসে উৎপাত করে বলে আমি অভিশাপ দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম। কেউ আশ্রমে প্রবেশ করে কোনোপ্রকার উপদ্রব করলে ওইভাবে বাঁধা পড়বে। তুমি তাদের বন্ধন মোচন করে অন্যায় করেছ।

রাজা বললেন, আপনি আসন গ্রহণ করন, শান্ত হোন মহর্ষি। আমি অত কথা বুঝিনি। ভেবেছিলাম কোনো দুর্বৃত্ত তাদের ওই দুর্দশা করেছে। রাজার যা কর্তব্য আমি তাই করেছি। অপরাধ যা হয়েছে মার্জনা করুন। বিশ্বামিত্র বললেন, রাজার ধর্ম সমস্তই কি তুমি পালন কর?

— হ্যাঁ মহর্ষি কোনো ত্রুটি তো করি না।

— রাজার কর্তব্য ঋষিদের দান করা, তা তুমি কর?

— হ্যাঁ তা করি। তাঁরা যা আদেশ করেন আমি তা পালন করি।

— আচ্ছা আমি আদেশ করছি আমাকে দান কর।

—আপনি যা আদেশ করবেন তাই দেব।

— তা যদি দাও, তবে তুমি আমাকে এই পৃথিবী দান কর।

— বেশ তো এই পৃথিবী আপনাকে দান করলাম। আপনি এই সিংহাসনে বসুন। এই রাজপ্রাসাদ আর সমস্তই আপনার। আমি বনে চললাম।

— যাবে কোথায়? দানের দক্ষিণা দিতে হবে,

—বেশ তো, রাজভাণ্ডার থেকে ধনরত্ন এনে দানের দক্ষিণা দিচ্ছি।

— রাজভাণ্ডার তো এখন আমার। সে তো আগেই আমাকে দিয়ে দিয়েছ। তাতে আর তোমার কোনো অধিকার নেই। কাশীধাম পৃথিবীর বাইরে। সেখানে গিয়ে যেভাবেই হোক তুমি দক্ষিণার ঋণ শোধ কর।

হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে রাজপ্রসাদ ত্যাগ করে পথে বের হলেন। রাজপুরীর সবাই কাঁদতে লাগল। কিন্তু ঋষির হৃদয় কিছুতেই গলল না। রাজা কাশীধামে গিয়ে এর ব্রাহ্মণের কাছে স্ত্রী ও পুত্রকে বিক্রি করলেন। তাতেও দক্ষিণার ঋণ শোধ হলো না। রাজা তখন মণিকর্ণিকা ঘাটের চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দক্ষিণার ঋণ শোধ করলেন। বিশ্বামিত্র পুরো দক্ষিণা পেয়ে অযোধ্যা শাসন করতে লাগলেন।

মহারানি শৈব্যা ব্রাহ্মণের বাড়িতে দাসীর কাজ করেন। পুত্র রোহিতাশ্ব পুজোর ফুল তুলে আনে। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে রোহিতাশ্বকে সর্পদংশন করল। রোহিতাশ্ব বিষের জ্বালায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারাল। এদিকে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের শূকর চরান আর শ্মশানঘাটে পয়সার বিনিময়ে মড়া পোড়ান। চণ্ডালের দাসত্ব করতে করতে হরিশ্চন্দ্রের চেহারা বিকট ও শ্রীহীন হয়েছে।

অন্ধকার রাত্রি। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে। শৈব্যা মৃত পুত্র কোলে করে শ্মশানে বসে আছেন। হরিশ্চন্দ্র হুংকার দিয়ে বললেন, কে রে অভাগিনী? পঞ্চাশ কাহন কড়ি দে, নইলে চিতা জ্বালব না। শৈব্যা বললেন, আমার কানাকড়িও নেই। হরিশ্চন্দ্র বললেন, আমি হুকুমের চাকর। কাঙালকে দয়া দেখানো আমার কাজ নয়। শৈব্যা বললেন, আমি কাঙাল ছিলাম না। এ রাজপুত্র। হায় রাজা হরিশ্চন্দ্র, কী সর্বনেশে তোমার দান। তোমার পুত্র আজ কড়ির অভাবে কুকুর-শেয়ালের মুখে পড়বে। হরিশ্চচন্দ্র চমকে উঠলেন! ছুটে গিয়ে মৃত পুত্রের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, রানি, পুত্র যখন মারা গিয়েছে, এস আমরা তিনজনে একসঙ্গে চিতায় পুড়ে মরি।

চিতা সাজিয়ে উঠতে যাবেন, এমন সময়ে ধর্মরাজ আবির্ভূত হয়ে রোহিতাশ্বকে জীবন দান করলেন। বিশ্বামিত্র কাছেই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি উপস্থিত হয়ে বললেন, মহারাজ, তোমার পরীক্ষা আজ শেষ হলো। তোমার রাজ্য, রাজধানী সব ফিরিয়ে নাও। আমি আমার আশ্রমে চললাম। ধন্য তোমার ত্যাগ। ধন্য তোমার দানশীলতা, ধন্য তোমার সহনশীলতা। তোমার কীর্তি স্বর্গে মর্ত্যে অমর হয়ে থাকবে।

(শ্বাশত ভারত থেকে)

ভারতের বিপ্লবী

মনোরঞ্জন সেন

বিপ্লবী মনোরঞ্জন সেনের জন্ম চট্টগ্রামের বরমায়। বাবার নাম রজনীকান্ত সেন। খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় বিপ্লবীদলে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। চারদিন পর ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের সংগ্রামে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন। ওই বছরই ৫ মে মাসে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের সময় তাঁর সঙ্গীরা সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হলে তিনি আত্মসমর্পণ না করে নিজের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য জলদাপাড়া অভয়ারণ্য বিখ্যাত।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকণ্ডের কুখ্যাত নায়ক জেনারেল ডায়ারকে গুলি করে হত্যা করেন উধম সিংহ।
- বিশ্বের উষ্ণতম স্থানের নাম আল আজিজিয়া।
- আমলকিতে রয়েছে অক্সালিক অ্যাসিড।
- বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে রয়েছে আর্গন নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাস।
- মানুষের মাথার ভারসাম্য রক্ষা করে কান।

ভালো কথা

রং-তুলির খেলা

লাবণি হালদার। নদীয়া জেলার চাকদা থানার পালপাড়া কাঁটালপাড়ার তেরো বছরের কিশোরী। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। এই বয়সেই রং-তুলিতে ঝড় তুলেছে। চোখের সামনে যা দেখে তা হুবহু এঁকে ফেলে চটপট। কয়েকদিন আগে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের সামনে বসে মাত্র ১১ মিনিটে তাঁর মুখমণ্ডল এঁকে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। লাবণির বাবা-মা দুজনেই ডেকোরেশন কাজের হস্তশিল্প সামগ্রীর কারিগর। বাবা-মার দেখাদেখি ছোটোবেলা থেকেই সে কাগজে আঁকিবুকি কাটত। কিছু আঁকাই তার কাছে খেলার মতো। একটু বড়ো হতেই আঁকার পাতায় পেনসিল, স্কেচপেন, রং-তুলিতে ভরে তুলতে শুরু করে। করোনার সময় সারাদিন সে রং-তুলি নিয়ে ছবি আঁকতো। সবার বিশ্বাস, লাবণি একদিন খুব বড়ো শিল্পী হবে।

তমাল ঘোষ, দ্বাদশ শ্রেণী, চাকদা, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন ম মে জা	(১) ক ল মূ বা তা ধ্য
(২) তৃ সা ক মা	(২) ম মো হা নি র য়া

১৬ মে সংখ্যার উত্তর

(১) খাসখবর (২) গালিগালাজ

১৬ মে সংখ্যার উত্তর

(১) খামচাখামচি (২) খিচিরখিচির

উত্তরদাতার নাম

(১) কৃষ্ণপ্রিয়া চক্রবর্তী, খাতড়া, রাজাপাড়া, বাঁকুড়া। (২) শ্রেয়সী ঘোষ, সেকেন্দারপুর, অমৃতি, মালদা। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৪)

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

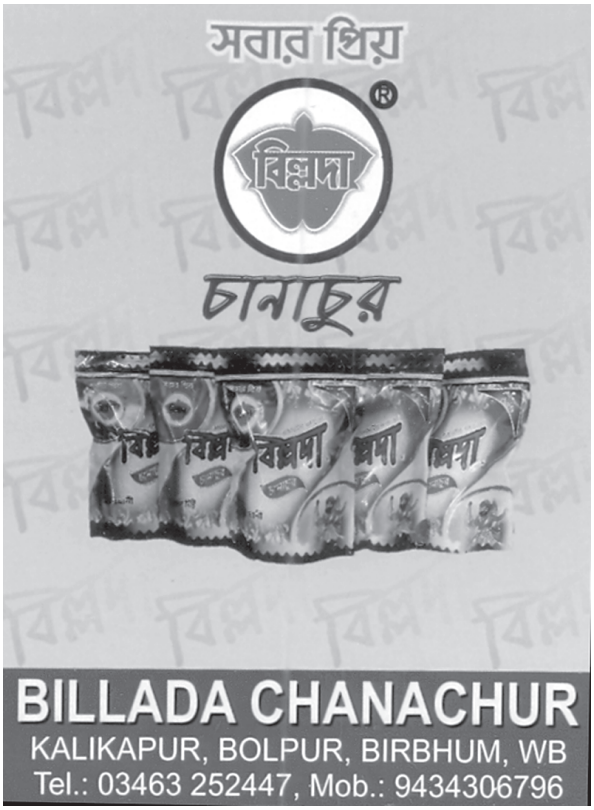

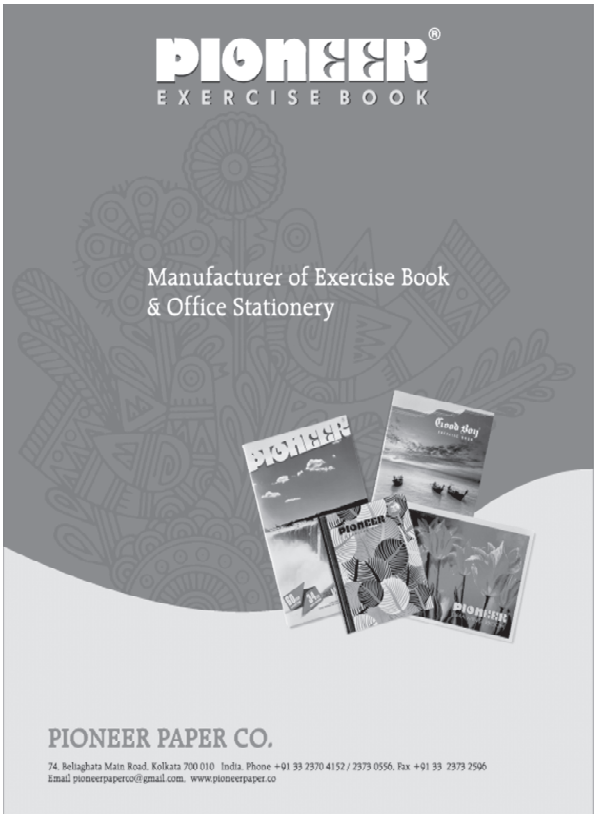

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে নিজেকেই নিজে সম্মানিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়দীপ রায়

বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রীকে পুরস্কৃত করলেন স্বয়ং বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী। কথাটা কেমন খটমট লাগছে তাই না! কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে এই শব্দবন্ধটি চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই বছর প্রথম বাংলা অ্যাকাডেমির নামাঙ্কিত একটি বিশেষ পুরস্কার চালু করেছে রাজ্য সরকার। কী সেই পুরস্কার! রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা বাংলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, সমাজ উন্নয়নে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করার পরেও যারা সাহিত্য ক্ষেত্রে নিরলস ভাবে সাহিত্য সাধনা এবং সাহিত্য সেবা করে চলেছেন, তাদের প্রতি তিন বছর অন্তর এই বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। তিনি বলেন, প্রারম্ভিক বছরে বাঙ্গলার সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মতামতের ভিত্তিতে যাকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কারণ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকরা নাকি জানিয়েছেন, নিরলস সাহিত্য সাধনা এবং কবিতা বিতান কাব্য গ্রন্থের জন্য প্রথম বছরের এই পুরস্কার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সম্মানিত করা হোক। তবে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলতে কাদের তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা তিনি খোলসা করেননি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এই ধরনের একটি পুরস্কার দেওয়াকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের মধ্যে থেকে সমালোচনা, হাসি-বিদ্রূপ ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শুধু সামাজিক মাধ্যম নয়, এই পুরস্কার দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সমাজের শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে

সাহিত্যিক ও সাহিত্য অনুরাগীরা। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সাহিত্য অনুরাগী, তাদের প্রত্যেকের বক্তব্যের নির্যাস হলো এই পুরস্কার মুখ্যমন্ত্রীকে কাউকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি স্বয়ং নিজেই নিজেকে দিয়েছেন। কারণ রাজ্যের যে দপ্তর তাঁকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করেছে সেই তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের মূল দায়িত্বে তিনি নিজেই রয়েছেন। তাই তাঁবেদারদের বেষ্টনীর

> “ক্ষমতার অলিন্দে থেকে চাটুকারদের দিয়ে জোর করে খ্যাতি অর্জন করাটা ক্ষণস্থায়ী হয় এবং পরবর্তীকালে এর পরিণাম হিটলার-মুসোলিনির মতো ভয়ংকর আকার ধারণ করে।”

মাঝে থাকা মুখ্যমন্ত্রী সেই চাটুকার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে প্রকারান্তরে নিজেকেই নিজে পুরস্কৃত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাক্তন আইপিএস নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীকে যে পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে সেটা আগে কোনোদিন ছিল না। কোনো পুরস্কার সৃষ্টি করতে গেলে তার একটা স্থায়ী কমিটি থাকে এবং সেখানে একটা রেজুলেশন পাশ করতে হয়। তারপর সিদ্ধান্ত হয় এই ধরনের সাম্মানিক পুরস্কারের জন্য কাকে মনোনীত করা হবে। যেমন বাংলা সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে নয় সদস্যের একটি কমিটি আছে এবং তারাই গুণমান বিচার করে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাংলা অ্যাকাডেমির ক্ষেত্রে এরকম কমিটি আছে কিনা, সেই কমিটিতে কারা আছেন অথবা কোন পদ্ধতিতে ব্যক্তি চয়ন করা হয় সেটা আমার জানা নেই। আমি এ ব্যাপারে বাংলা অ্যাকাডেমির প্রাক্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান পবিত্র সরকার থেকে শুরু করে অ্যাকাডেমির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেও কোনও সদুত্তর পাইনি। এমনি বাংলা অ্যাকাডেমির কোনও

ফঃ ৬

ওয়েবসাইটও সার্চ করে খুঁজে পাইনি। সুতরাং কোন মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে মুখ্যমন্ত্রীর নাম নির্বাচন করা হয়েছে সেটা আমার কাছে ধোঁয়াশাপূর্ণ। তবে রাজ্য সরকারের যে দপ্তর এই সম্মান প্রদান করেছেন, সেই দপ্তরের চেয়ারম্যানই সেই পুরস্কার গ্রহণ করছেন সেটা আমার কাছে একটা হাস্যকর ব্যাপার।"

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীকে এই সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা রয়েছে বলে সাহিত্য অ্যাকাডেমির সিলেকশন কমিটির সদস্য অনাদি রঞ্জন বিশ্বাস পদত্যাগ করেছেন। পাশাপাশি গুণমান বিচার না করে মুখ্যমন্ত্রীকে এহেন পুরস্কার দেওয়ার জন্য এবং বাংলা অ্যাকাডেমির এই অস্বচ্ছতা ও স্তাবকতার প্রতিবাদে বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক রত্না রশিদ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদাশঙ্কর স্মারক সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর এই সম্মান ফেরানোর কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, এত নিম্নমানের লেখার জন্য, শুধুমাত্র স্তাবকতা করতে কাউকে যদি পুরস্কৃত করা হয় তা সাহিত্য জগৎকে কলুষিত করেছে। যদিও এর পালটা হিসেবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দেবাংশু ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর বই বেস্ট সেলার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রত্না রশিদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক'জন লোক চেনেন! মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকা বুদ্ধিজীবী সুবোধ সরকার এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, এই পুরস্কার শুধু মাত্র সাহিত্য রচনার জন্য দেওয়া হয়নি। সমাজে যারা নিরসল ভাবে কাজ করার পাশাপাশি সাহিত্য সেবা করে চলেছেন তাদেরকেই এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। তিনি তাঁর টুইটারে বিস্ময় প্রকাশ করে জানিয়েছেন ''কী! মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বাংলা অ্যাকাডেমির সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে? তিনি বিদ্রূপ করে বলেছেন, ওর লেখা হাম্বা হাম্বা কবিতাটি তার সংকলন বইতে আছে তো! ভালো হয়েছে আমি কলকাতায় থাকি না। টাকা, ক্ষমতা, নাম আর পুরস্কারের লোভ মানুষকে অনেক ক্ষুদ্র বানিয়ে দিয়েছে। খুনি, ডাকাত চোর বদমাশরা নির্লজ্জ হলে মানায়। কিন্তু যখন শিল্প-সাহিত্যের লোকেরা নির্লজ্জ হয়, তখন সেই সমাজ থেকে সামান্য আশা করার কিছু থাকে না।'' নিম্নমানের লেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান দেওয়াকে কেন্দ্র করে যখন বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে তখন তাকে আড়াল করতে কাকশিল্পী বলে পরিচিত সেই শুভপ্রসন্ন বলেছেন, ''রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিজে এসে মমতার হাতে ওই পুরস্কার তুলে দিতেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ এদের মতো হিংসুটে ছিলেন না।" এর পালটা বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার এ রাজ্যকে হীরক রাজার দেশের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে এখন চাটুকার ও স্তাবকতার রাজত্ব চলছে। যে মুখ্যমন্ত্রী সরস্বতী মন্ত্র থেকে চণ্ডী মন্ত্র ভুলভাল বলেন তিনি যে কত বড়ো সাহিত্যিক তা রাজ্যের মানুষ ভালো ভাবেই জানে। আর তাকে যারা মনোনীত করেছেন তারা কোনও কবি-সাহিত্যিক নন, তারা সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর স্তাবক ও চাটুকার।

বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ বলেছেন, যারা মমতাকে সাহিত্য চর্চার জন্য এই সম্মান দিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই জানেন মমতার লেখা এতটাই নিম্নমানের যে তিনি এই সম্মানের যোগ্য নন। আসলে তারা মমতার যেটুকু সম্মান ছিল সেটুকু সম্মান নষ্ট করার জন্য তাকে এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

প্রাক্তন মহানাগরিক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, আবোল-তাবোল কিছু শব্দ বসিয়ে দিলেই সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল হয়ে যায় না। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানটাই মিথ্যা দিয়ে শুরু। নারদা-সারদা-সহ একগুচ্ছ অপরাধের সঙ্গে তিনি যুক্ত। তিনি তার রাজনৈতিক জীবন মিথ্যা শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে শুরু করেছেন। সেই মানুষকে শুধুমাত্র খুশি করার জন্য এবং নিজেদের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে যে পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে সেটা সাহিত্য অ্যাকাডেমি থেকে দেওয়া হয়নি। তাকে বাংলা অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য মানুষ হাসাহাসি করছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে এটা রবীন্দ্রনাথকে অপমান করা হয়েছে। যারা স্বৈরাচারী হন তারা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে গর্ববোধ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার লাইন উদ্ধৃতি করে বলেন, 'নিজেরে করিতে সম্মান দান, নিজেকে করিও না কভু অপমান'। এরা তো নিজেরাই নিজেদের অপমান করছেন, এর বাইরে আর কী বলবো। যিনি পুরস্কার পেয়েছেন তার যদি ন্যূনতম আত্মসম্মান বোধ থাকতো তাহলে তিনি নিজেই বলতেন আমি এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নই। কিন্তু তিনি তাদের বলেছেন, 'আমাকেই এই পুরস্কার দিতে হবে বলে তিনি তার পরিমণ্ডলে থাকা স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের এই পুরস্কার তাঁকে দিতে বাধ্য করিয়েছেন।' ঠিক একই ভাবে ভাইস চ্যান্সেলর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের তিনি সেনেট-সিন্ডিকেটে রেখেছেন তাদের উনি বাধ্য করিয়েছেন যে আমাকেই ডিলিট দিতে হবে। এর ফলে এই ধরনের পুরস্কারের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে।

অধ্যাপক বিমলশঙ্কর নন্দ বলেছেন, ক্ষমতা যখন খ্যাতি বাড়াতে সাহায্য করে সেটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী হয়। হিটলার যখন কথা বলতো তখন তার স্তাবকরা হে হিটলার, হে হিটলার করতেন। কিন্তু তিনি যখন শেষ হয়ে গেলেন তখন লোকে তাকে থুতু ছিটাতে শুরু করেছিল। একই ভাবে মুসোলিনি যখন কথা বলতেন তখন সবাইকে দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে তার কথা শুনতে হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই মুসোলিনির মৃতদেহ টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। লোকে তার গায়ে থুতু দিত। তার একটাই কারণ এরা সকলের ক্ষমতার দম্ভে খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই খ্যাতি ছিল জোর করে আরোপিত একটা খ্যাতি। তাই ক্ষমতার অলিন্দে থেকে চাটুকারদের দিয়ে জোর করে খ্যাতি অর্জন করাটা ক্ষণস্থায়ী হয় এবং পরবর্তীকালে এর পরিণাম হিটলার-মুসোলিনির মতো ভয়ংকর আকার ধারণ করে। □

মহিলা ক্ষমতায়নের জন্যই জেন্ডার বাজেটিং যোজনা

নীলাঞ্জনা রায়

সাম্প্রতিককালে আমাদের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন মহিলা সমন্বয়ের একটি জাতীয় স্তরের ভার্চুয়াল সভায় জেন্ডার বাজেটিং সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন দিয়ে শ্রোতাবৃন্দকে সমৃদ্ধ করেন। নির্মলাজী সকল প্রবীণ নেতৃবর্গকে এবং উপস্থিত সেবিকা সমিতি ও মহিলা সমন্বয়ের কার্যকর্তাদের নমস্কার জানিয়ে জেন্ডার বাজেটিং কী এবং কেন তার বিস্তারিত, সহজ ও সুন্দর ব্যাখ্যা করেন।

এই বাজেট অতিমারীর পরিচালন এবং অতিমারী পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে দেশের পুনরুজ্জীবনের চিন্তা থেকে বানানো। সেই উদ্দেশেই আগামী দুই থেকে তিন বছরের যে পরিকল্পনা তা করা হয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনতম সরকার এবং সর্বাধিক পরিচালনা ('মিনিমাম গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম গভর্নেন্স') দেশে কীভাবে সম্ভব তার একটি রূপরেখা রাজ্যশাসন প্রণালীর মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। প্রতি বছর যদি কর নীতি পরিবর্তিত হয় এবং সর্বোপরি ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতি বছরে যদি নীতি পরিবর্তন করা হয় তাহলে ব্যবসায়ীরা আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করেন, বিনিয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেন। কারণ তাঁরা আশঙ্কায় ভোগেন যে সরকার হয়তো আগামী বছরও আবার নীতি পরিবর্তিত করবে। এই কারণেই ধারাবাহিকতা প্রয়োজন, বিশেষ করে এই দেশে নতুন নতুন বিনিয়োগের জন্য আমরা উৎসাহ দিয়ে চলেছি। শুধুমাত্র ভারতীয় পুঁজি ব্যবহার করে বিনিয়োগ নয়, দেশীয় প্রযুক্তিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক নতুন স্টার্ট-আপ কোম্পানি তাদের নতুন ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে নতুন ভাবে বিনিয়োগের দিশা দেখাচ্ছেন। এদের অনেকেই বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করতেও প্রস্তুত।

২০১৪ থেকে আজ অবধি এর মধ্যে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য কী ধারাবাহিকতা আছে, সেটা আমি বলতে চাই। ২০১৪ থেকে ধারাবাহিকতা এটা যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নামে জন্মলগ্ন থেকেই বা জন্মের আগে থেকেই মায়ের পুষ্টি অভিযান, মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, যাতে প্রত্যেকটি মেয়ে স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্ম দিতে পারে, তাদের সঠিক লালনপালন করতে পারে, যাতে মায়ের প্রাণশক্তি ভরপুর থাকে, তাই পুষ্টি অভিযানের সঙ্গে মহিলা কার্যকর্তাদের সহায়তায়, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সহায়তায়, মহিলাদের জন্য বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আরও অনেক অভিযান চালানো হয়েছে। এছাড়া শিশু, বিশেষ করে কন্যাসন্তানরা যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন সেই বিদ্যালয়ে ভালো সঠিক মাত্রায় শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং মেয়েদের পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি আমরা বরাবরই একাগ্র দৃষ্টিপাত করে এসেছি।

এছাড়া মহিলা সমন্বয়ের দুটি আলোচনাসভায় (যেখানে আমি শামিল ছিলাম) লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতি ১০০০ পুরুষে কতজন মহিলা আছেন এটা একটা ভাবার মতো বিষয়। দেখা গেছে যে ৯০০-রও কম মহিলা। যেখানে ১০০০ পুত্রসন্তান, সেখানে কন্যাসন্তানের হারও মানানসই হতে হবে। ভারতে ঐতিহাসিকভাবে এমন রাজ্যও আছে, যে রাজ্য সবদিক থেকেই উন্নত, শিক্ষাক্ষেত্রে, মাথাপিছু গড় আয়ে; কিন্তু সেইসব রাজ্যেও লিঙ্গ সমতা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ হরিয়ানা, তামিলনাড়ু— যেখানে ভ্রূণহত্যা প্রচলিত ছিল। সচেতনতা বৃদ্ধির দ্বারা, মহিলাদের সম্মান প্রদানের দ্বারা বর্তমানে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে পুরুষ মহিলা অনুপাত এখন লিঙ্গ সমতা ছুঁয়ে গেছে। যে সব রাজ্য এই সম্পর্কে স্পর্শকাতর সেখানেও সঠিক মাত্রায় কাজ হচ্ছে।

এছাড়া শিক্ষা, কন্যাসন্তানের উচ্চশিক্ষার উপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে, জেক স্টেম (বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল-ডাক্তারি) শিক্ষা বলে মেয়েদের প্রসার ঘটানো আমাদের লক্ষ্য। এর মধ্যে যে মহিলা বিজ্ঞানী খুব প্রখরতা দেখাচ্ছেন, বিশেষ করে মেয়েরা মহাকাশ প্রযুক্তিতে খুব সফল হচ্ছেন, তাদের ছবি এবং কাজের স্বরূপ প্রত্যন্ত গ্রামেও

পৌঁছে দিতে হবে। বোঝাতে হবে যে মেয়েরা সুগৃহিণী হয়েও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অনেক কাজ করছেন। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। বোঝাতে হবে যে ভ্রূণহত্যা ঠিক নয়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের স্থান উন্নত হলে মেয়েরা আরও অনেক এগিয়ে যাবে। এই ধরনের অনেক প্রয়াস ২০১৪ থেকে ২০১৮-১৯ অবধি হয়ে চলেছে, যার পরিণামে অনেক রাজ্যেই জনসংখ্যা অনুপাত বর্তমানে অনেক স্থিতিশীল হয়েছে। যে সমস্ত সামাজিক শ্রেণীর মানুষে তাদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতেন না, তাদের মনে অনেক দ্বিধা ছিল। সেই শ্রেণীর মানুষেরাও তাদের কন্যাসন্তানদের আজকাল নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন। সেই মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করার প্রবণতাও ইদানীং বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে জনজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত, কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত মেয়েদের এখন নিয়মিত শিক্ষার হার, শিক্ষাঙ্গণে প্রবেশের হার অনেকটাই বেড়েছে। এই সমস্ত প্রণিধান করে আমরা বাজেটের মাধ্যমে আরও কী করতে পারি, সেটাই জেন্ডার বাজেটিঙের বিষয়।

আরও একবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বলা যে, জেন্ডার বাজেট শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য আলাদা করে তৈরি বাজেট নয়। ঐতিহ্যগত ভাবে মহিলা ও শিশু অথবা বাল কল্যাণমন্ত্রকের মাধ্যমে যে অর্থ খরচ হয় তা মহিলাদের জন্যই হয়। এই মন্ত্রকগুলি ছাড়াও বাকি সমস্ত মন্ত্রকেও যে খরচ হচ্ছে, তাতে মহিলাদের জন্য কতটা এবং কীভাবে খরচ হচ্ছে, সেটা দেখার প্রক্রিয়াই হচ্ছে জেন্ডার বাজেটিং। মহিলাকেন্দ্রিক দপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরে কীভাবে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে তাকেই আমরা জেন্ডার বাজেটিঙের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। বাজেট তৈরি করার সময়ে যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হয় তাতে মহিলারা কতটা উপকৃত হবেন সেই সক্রিয় ভাবনাকেই জেন্ডার বাজেটিং বলে। যখন কোনও কৃষক আত্মহত্যা করে তখন সরকার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার পরিবারকে এককালীন কিছু অর্থ সাহায্য করে। তাতেই কি আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? একদম না। যে রাজ্যে সেই কৃষক পরিবারের ভূমির মালিকানা মহিলাদের অধিকারের মধ্যে অন্তর্গত হয়, সেখানে পুরুষ কৃষকের মতো মহিলা কৃষকও সকল সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জমির দলিল এবং জমির শিরোনামের মালিকানা যদি মহিলাদের নামে কৃত হয়ে থাকে তাহলেই মহিলা কৃষক পুরুষ কৃষকের মতো সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হবেন। অনেক রাজ্যের আইন সেই মোতাবেক করা হচ্ছে। তাহলে বাজেট কারার সময়েই কৃষক যদি মহিলা হয় তাহলে সে কী সুযোগ সুবিধা পাবে, কত লভ্যাংশ পাবে তা নির্ণয় করা সহজ হয়। এই চিন্তাভাবনা দিল্লি থেকে সমস্ত রাজ্যেই পৌঁছনো প্রয়োজন।

আজকাল অনেক এফপিও (ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন) কাজ করছে। সাধারণত কৃষক বলতে আমরা পুরুষ কৃষকই বুঝে থাকি। যেমনভাবে গ্রামে গ্রামে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে, যারা আঞ্চলিক স্তরে সরকারি অর্থসাহায্য নিয়ে ব্যবসা করেন, ব্যাঙ্ক লোনেরও ব্যবস্থা করেন, ব্যবসার লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। গত প্রায় ৩৫ বছর ধরে এই ব্যবস্থা চালু আছে। কিছু রাজ্য এই প্রকল্প খুব ভালো করছে। অনেক মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সফলভাবে কাজ করছে। কিন্তু কিছু রাজ্য স্বনির্ভরগোষ্ঠী কম আছে। তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ঠিক একইভাবে ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন কাজ করবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী যেমন চলছে, তার সঙ্গেই যদি লাভজনক ও কৃষি সম্পর্কিত কাজ করতে হয় তাহলে ফার্মের প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন তৈরি করতে হবে। সমস্ত কৃষক, মহিলা ও পুরুষ, মিলে এই অর্গানাইজেশন বানাবেন। শুধুমাত্র কৃষক নন, ধীবর সম্প্রদায়, পশুপালক সম্প্রদায়, সকলেই এই ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন করতে পারবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের এফপিও বানিয়ে তাদের পণ্য লাভজনক বিক্রি করে, সেই লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারবে। কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় লাভের কথা কিছু নেই। কিন্তু এফপিও-র মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। গ্রামে যত রকমের শস্য উৎপন্ন হয় এফপিও-র মাধ্যমে তাকে একত্রিত করে স্টোরেজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে জোজি স্টোরেজ না থাকে তাহলে সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন স্টোরেজ বানানোর প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করবে। এই স্টোরেজেও নির্ধারিত ভাড়া দেবে। তারপর পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে তাকে কৃষক (এবং অন্যান্য পণ্য উৎপাদনকারী) যেখানে খুশি, যার কাছে খুশি, এমনকী অনলাইন পোর্টালেও বিক্রি করতে পারবেন। এই প্রকল্প আগের বাজেটেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এই বাজেটে আবারও বলা হচ্ছে যে এফপিও গঠন করো, তার মাধ্যমে, এই সকল অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সবকিছুতেই মহিলারা সমক্ষমতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

যেমন পিএম মুদ্রা প্রকল্প : সেখানে তিন স্তরের মানুষের ঋণ নেওয়ার সুযোগ আছে। শিশুদের জন্য ১০০০/- অবধি, যুবক-যুবতীদের জন্য ৫০০০০/- অবধি এবং মধ্যবয়সিদের জন্য ১০০০০০/- অবধি ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত করা আছে। এই ঋণে সুদের হার খুবই সামান্য এবং কোনও সিকিউরিটি এতে প্রয়োজন হয় না। এই ঋণ ছোটোখাটো ব্যবসা চালানোর জন্য দেওয়া হয়। আনন্দের কথা এই যে বর্তমানে এই প্রকল্পে ৫০ শতাংশ বেশি মহিলা যুক্ত আছেন। বাজেট তৈরি প্রারম্ভ থেকেই খুব সচেতন ভাবে মহিলাদের যুক্ত করার চেষ্টা ছিল এবং আজ তার ফলও পাওয়া যাচ্ছে।

পিএম সমৃদ্ধি যোজনা একেবারে ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীদের জন্য। এই একদম ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের একটা বড়ো অংশ মেয়েরা— যারা ফুল-ফল-সবজি-মাছ বিক্রেতা। যারা রাস্তার পাশে অস্থায়ী দোকান চালায়। এই প্রকল্পেও কোনোরকম সিকিউরিটি ছাড়াই ঋণ পাওয়ার সুবিধা আছে।

পিএম জনধন যোজনা দ্বারা সব মানুষই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে। এই অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা জমা না রাখতে পারলেও এটিএম কার্ড থাকবে, সরাসরি বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে যে কোনও টাকা এই অ্যাকাউন্টে জমা করা যাবে, পেনশনের টাকা আসবে, এমনকী গ্রামে গ্রামে

যে মহাত্মা গান্ধী রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমে কাজ হয়, তার টাকাও এই অ্যাকাউন্টে চলে যায়। আজ পর্যায়ক্রমে ৬০ শতাংশ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করছেন। মহিলাদের নামে অ্যাকাউন্ট, সেই অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা-পয়সা জমা পড়ছে, তার হাতে পরিচয়পত্র রূপে কার্ড, যে ফোনই থাকুক না কেন তাতে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত সমস্ত মেসেজ আসবে। আজও দেশের সকল গ্রামে গ্রামে ইট সুরকির ব্যাংক তৈরি করা সম্ভব নয়, কিন্তু গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে ব্যাংকিঙের সুযোগ সুবিধা। ব্যাংকবান্ধব বা ব্যাংক করেসপন্ডেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকিঙের সুযোগ গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই ব্যাংকবান্ধবরা যে গ্রামে ব্যাংক নেই সেই সব গ্রামে ঘুরে ঘুরে পয়সা তোলা, পয়সা জমা করা এবং ব্যাংকের সমস্ত প্রকার কাজ গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। মার্চ ২০২০, এপ্রিল ২০২০, মে ২০২০, জুন ২০২০, যখন সম্পূর্ণ লকডাউন ছিল, তখনও এই ব্যাংকবান্ধবরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাদের কাজ ভালো ভাবে চালিয়ে গেছেন। লক ডাউনের আগে, লক ডাউনের সময় ও লকডাউনের পরেও এরা খুব ভালো কাজ করছেন। কিন্তু লকডাউনের পরে এদের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। আমি ত্রিপুরাতে গেছিলাম, কিছু গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ছিল। এখানে প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা ব্যাংকবান্ধব আমার সঙ্গে দেখা করেন। অর্থাৎ আজকাল এতো সংখ্যক মেয়ে ব্যাংকবান্ধব রূপে কাজ করছেন। একদম ছোটো ছোটো গ্রামের মহিলা আশেপাশের ১০/১৫টি গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই কাজ করে ৫০০০০/- অবধি আয় করছেন। প্রধানমন্ত্রীও একটি অনুষ্ঠানে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তিনি জানতে চান যে টাকা আয় করছেন কিন্তু হাতে এতো টাকা নিয়ে ঘুরছেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিচ্ছেন, নিচ্ছেন, তারপর ব্যাংকে গিয়ে জমা করছেন, আপনাদের ভয় করে না? ব্যাংকবান্ধব বলেন জানান যে কোনো ভয় নেই, কাজ করতে হবে। আজকাল এতো প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতার গল্প উঠে আসছে, এতো নতুন নতুন উপায় মহিলারা কাজ করছেন যে তাতে সামগ্রিক ভাবে সমাজের উপকার হচ্ছে। ব্যাংকও আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে যে আমরা গ্রামে শারীরিক ভাবে না পৌঁছতে পারলেও, ব্যাংকিং পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি। মহিলাদের ভূমিকা এতো ভালো হচ্ছে, তাঁরা এমএ/পিএইচডি কিছু করেননি। এই মহিলারা সাধারণ স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন কিন্তু এতো উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করছেন যে তা বলার নয়। আমি এই তিনটি উদাহরণ দিয়ে বলছি যে, মূল কথা হলো যে বাজেট তৈরির সময়েতেই যদি এমন প্রকল্পের প্রস্তাবনা থাকে যাতে মহিলারাও শামিল হতে পারেন, তা কৃষকই হন বা ধীবর পরিবারের হন, তাহলেই সঠিক দিশায় চলা যায়। যেমন পশ্চিমবঙ্গে ও তামিলনাড়ুতে খেজুরগাছ এবং পামগাছের রস ধরা হয়। গাছ থেকে রস বার করার কাজটা ছেলেরাই করে। পশ্চিমবঙ্গে নলেন গুড় বা তামিলনাড়ুতে তাল গুড় তৈরির কাজটা সম্পূর্ণ ভাবেই মেয়েরা করে। পুরুষরা সমুদ্র থেকে মাছ নিয়ে আসে; কিন্তু তারপরে সেই মাছ শুকিয়ে রাখার দায়িত্ব মেয়েদেরই। এই মহিলাদের এখন ব্যাংক থেকে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। তারা ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে ঋণ পাচ্ছেন যাতে তারা নিজেরাও কিছু করতে পারেন। এছাড়া দেশের তাঁতি পরিবারের মেয়েদেরও ব্যাংকার মাধ্যমে যাবতীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে সহায়ক পাঠানো হয়। যারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রকল্প সম্বন্ধে মহিলাদের ওয়াকিবহাল করান এবং বুঝিয়ে দেন যে এই সমস্ত ঋণে কোনওরকম সিকিউরিটি লাগে না। সঠিক পরিকল্পনার কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থা এতটাই সুচারু হয়ে গেছে যে ছোটোখাটো ঋণের প্রক্রিয়া এখন অনলাইনেই সম্ভব। এমনকী ইমেইলেরও প্রয়োজন পড়ে না, এসএমএস হয়ে যায়। বাজেট পরিকল্পনায় এই সমস্ত পরিকল্পনা এবং পরিবর্তন আনাতে মহিলাদের এখন অনেক সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাই জেন্ডার বাজেটিং। সমস্ত মন্ত্রকই এই জেন্ডার বাজেট সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করে। কেউ যদি জানতে চায় যে কতজন মহিলা সুবিধা পেল তাও সংরক্ষিত থাকে।

উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে কোনো মেয়ে যদি দক্ষতা উন্নয়ন করতে চায়, তারও ব্যবস্থা এই বাজেটে রাখা হয়েছে। অনলাইন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। অঞ্চলের স্থানীয় কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বা অনলাইনে যদি মেয়ে প্রশিক্ষণ নিতে চায় তাহলেও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করবে। অসংগঠিত সেক্টরে মহিলাদের জন্য শ্রমমন্ত্রকের মাধ্যমে একটি ই-পোর্টাল চালু আছে। ক্রেতারা জিএসটি রেজিস্টার দেখেন, কার কাছে কী পাওয়া যাবে, কে কে আছেন। তার কাছ থেকেই কিনতে চান যে ট্যাক্স রিটার্ন দেন। মহিলাদের জন্য এই সমস্ত রাস্তা যখন আছে সেগুলো সম্পর্কে জানা ও সচেতনতা তৈরি করা আশু প্রয়োজন।

শেষে আরও একটি বিষয় বলবো। আপনারা জানেন যে বিগত তিন চার বছর ধরে আমরা চেষ্টা করছি সৈনিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করানোর জন্য। পড়াশোনার পর মেয়েরা সেনাতে প্রবেশ করতে পারবে পূর্ণ সময়ের জন্য। আজ দেশে সমস্ত সৈনিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করানো যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতেও মেয়েরা যোগদান করতে পারে। অনেক মেয়ে পাইলট হচ্ছেন, ফাইটার বিমানে মহিলারা পাইলট। এখন সেনা স্কুল এবং এনডিএ-তে পড়াশুনা শেষে মেয়েরা সেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনা, কোস্টগার্ড সবকিছুতেই জায়গা পাবেন, শুধু নার্স বা ডাক্তার হয়ে নয়, এখন সেনায় যোগ হওয়ার পথ মোদীজী খুলে দিয়েছেন। এর চাইতে বেশি ক্ষমতায়ন মেয়েদের জন্য আর কী হতে পারে। এই কারণে আমি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও থেকে শুরু করে, গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি থেকে শুরু করে, ভ্রূণহত্যা বন্ধ করা থেকে শুরু করে, স্কুল সুবিধা, স্টেম সাইন্সে মেয়েদের অন্তর্গত করা, গ্রামে ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন, ধীবর মহিলা, মুদ্রা লোন, পিএম জনধন, এই সব কিছুতে মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা, এইসব বিষয় একবার ক্যানভাসে রেখে দেখবো, আমাদের সমাজ সম্পর্কিত কোনো বিষয় নেই যেখানে সরকার মহিলাদের আরও বড়ো ভূমিকা দেয়নি । আমাদের সরকার সমস্ত সেক্টরে মেয়েদের প্রাধান্য দিয়ে তাদের সুযোগ করে দিচ্ছেন।

খামখেয়ালি আবহাওয়ায় বিপাকে মালদার আম চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা এবং উপর্যুপুরি ঝড়ে

নাস্তানাবুদ মালদার আম চাষিরা। যেভাবে জেলাজুড়ে আমের ক্ষতি হয়েছে তাতে এবছর আমের ফলন প্রত্যাশার চেয়ে অনেকটাই কম হয়েছে বলে জানাচ্ছেন উৎপাদকরা। শুধু তাই নয় করোনার ক্ষতি কাটিয়ে এবছর বিদেশে যে পরিমাণ আম রপ্তানির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তা অনেকটাই ধাক্কা খাবে বলে মনে করা হচ্ছে। দুশ্চিন্তায় রয়েছেন উৎপাদক মহল থেকে জেলা উদ্যান পালনের আধিকারিকরাও।

প্রসঙ্গত, মালদায় ৩১ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়। আগে আমের মরসুমে এবং অফ সিজনেও প্রযুক্তি ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরই গড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিকটন আমের উৎপাদন হয়ে থাকে। কখনও ফলন চার লক্ষ মেট্রিক টনের কাছেও পৌঁছে যায়।

কিন্তু জেলার ম্যাঙ্গো মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা জানিয়েছেন, এবছর এই উৎপাদন কমে আড়াই লক্ষ মেট্রিকটনে নেমে আসতে পারে। ফলে লাভের সম্ভাবনা যেমন অনেকটাই কমবে, তেমনই বেশ কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীনও হতে পারেন, আমচাষিরা।

মালদার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন। 'এবছর প্রাকৃতিক কারণেই মালদার আম স্বাভাবিকভাবে পাকতে অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি সময় নিয়েছে। জেলার প্রায় ৪৫ শতাংশ আমগাছে নতুন পাতা গজিয়ে ওঠায় গাছগুলিতে সেভাবে ফল ধরেনি। মোট আমবাগানের ১০ শতাংশেরও বেশি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ৩১৪৪ হেক্টর বাগানে ৩৭ হাজার ৫০৮ মেট্রিকটন আমের ক্ষতির হিসেব পাওয়া গেছে।

খালিস্তানি জঙ্গিদের দিয়ে রেললাইন ওড়ানোর ষড়যন্ত্র পাকিস্তানের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এবার ভারতের রেললাইন উড়িয়ে দেওয়ার ছক পাকিস্তানের। নেপথ্যে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। সূত্রের খবর খালিস্তানি জঙ্গিদের স্লিপার সেলগুলিকে

পঞ্জাব-সহ বিভিন্ন রাজ্যে রেললাইন ওড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থাটি। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য হাতে আসায় নিরাপত্তা এজেন্সিগুলোকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। গোয়েন্দাসূত্রে খবর, বিশেষ করে মালগাড়ি যাওয়ার সময়টাকে কাজে লাগিয়ে রেললাইনে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা নিয়েছে আইএসআই।

সম্প্রতি হরিয়ানার কার্নাল জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র ও আইইডি-সহ গ্রেপ্তার হয় চার শিখ যুবক। খালিস্তানি জঙ্গিরা অন্য রাজ্যগুলিতেও তাদের নেটওয়ার্ক ছড়াতে চাইছে। তাদের কাজে লাগিয়েই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাশকতা ঘটাতে তৎপর হয়ে উঠেছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই।

বন্ধন ব্যাংকের মুনাফা বাড়লো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে বন্ধন ব্যাংকের নিট মুনাফা দাঁড়ালো ১ হাজার ৯০২ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের তুলনায় তা ১ হাজার ৭৪৭ শতাংশ বেশি। গত মার্চ মাস পর্যন্ত এখানে মোট ঋণের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৯৯ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা।

বৃদ্ধির হার ১৪.১ শতাংশ। অন্যদিকে আমানতে জমা টাকার ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ২৩.৫ শতাংশ। মোট আমানতের পরিমাণ ৯৬ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা। বন্ধন ব্যাংকের এমডি ও সিইও চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন, '২০২০-২১ অর্থবর্ষের নিরিখে কারেন্ট ও সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ১৮.৫ শতাংশ বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে, যা ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার নিরিখে অত্যন্ত ভালো জায়গায় রয়েছে। গত মার্চে আর্থিক বছর শেষে ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২.৬৩ কোটি। এর থেকেই প্রমাণিত, দেশের জনগণ আমাদের উপর আরও বেশি করে আস্থা রাখছেন।'

স্পেশাল অলিম্পিকে জাতীয় অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন বীরভূমের পাপিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এ বছর জুলাইয়ের শেষে স্পেশাল অলিম্পিক ইউনিফায়েড ফুটবলের আসর বসছে আমেরিকার মিশিগানে ডেট্রয়েড শহরে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের যুগ্ম অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন, বীরভূমের পাপিয়া মুর্মু। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা পাপিয়া একজন জনজাতি কন্যা। বাবা শিবলাল মুর্মু গ্রামেই একটি ছোটো মুদিখানার দোকান চালান। কঠোর পরিশ্রম এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয় তাদের জীবন। খেলাধুলোয় আলাদা নজির সৃষ্টি করার পাশাপাশি সমান তালে চলছে মেয়ের পড়াশোনা। বর্তমানে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী পাপিয়া। বীরভূম জেলার সর্বশিক্ষা মিশনের কো-অর্ডিনেটর শুকদেব চক্রবর্তী জানান, 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হলেও বল পায়ে পেলেই মাঠময় দৌড়ে বেড়াতো পাপিয়া। পরবর্তীতে ফুটবলে তাঁর স্কিল পরিণত হতে থাকে।' নিজের দক্ষতাতেই আজ ভারতীয় ফুটবল দলের যুগ্ম অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছে বীরভূমের সিউড়ির ১ নম্বর ব্লকের

কাঁটাবুনি গ্রামের পাপিয়া। দেশের পাশাপাশি নিজের জেলাকেও গর্বিত করেছে সে। গ্রামবাসীদের কথায়, কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতা পাপিয়াকে এই সম্মান এনে দিয়েছে। পাপিয়ার এই অনন্য নজিরের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছে কল্যাণ আশ্রম। গত ২৩ মে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বীরভূম শাখার সদস্যরা এই অষ্টাদশী জাতীয় ফুটবলার ও তার কোচ মৃণাল মালকে সংবর্ধনা জানান। পাপিয়ার বাবা, মা ও দিদি সবাই ফুটবলার। এদিন সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের বীরভূম জেলার সম্পাদক দিবাকর টুডু, সহ-সম্পাদক দেবব্রত মাহাতো, লক্ষ্মণ বিষ্ণু, ভরত ঘোষ প্রমুখ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাপিয়া বলেন, 'দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য পেয়েছি। এটা নিঃসন্দেহে আমার কাছে আনন্দের খবর। তবে নিজের দায়িত্ব ও দেশের প্রতি কর্তব্য আমি নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে চাই।' পাপিয়ার কোচ মৃণাল মাল পাপিয়ার এই কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত। পাপিয়া বিদেশের মাটিতে নিজের সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে দেশকে গর্বিত করবে বলে আস্থা প্রকাশ করেন তিনি।

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে **'বাঙ্গলায় সঙ্ঘের কাজের ইতিহাস'** নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০/ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০/ টাকা।

বিস্তারিত পরে জানানো হচ্ছে। প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২।

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ
(D.A.T.H.R.Y.)

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ, ও কুন্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন - প্রাণায়াম - মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক - চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বছর। ২৬শে জুন থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস ঃ প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট
1977
অব কালচার, যৌগিক কলেজ
Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi, Govt. of India

কোর্স ফি ঃ ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা। ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস ঃ ১০০ টাকা
১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কল-২৯
9051721420 / 9830597884

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১।।

বাংলাদেশের বরিশাল জেলার খলিসাকোটা গ্রাম। অনেক পণ্ডিত মানুষ থাকতেন সেখানে। লোকে গর্ব করে বলত, 'নিম্ন নবদ্বীপ'।

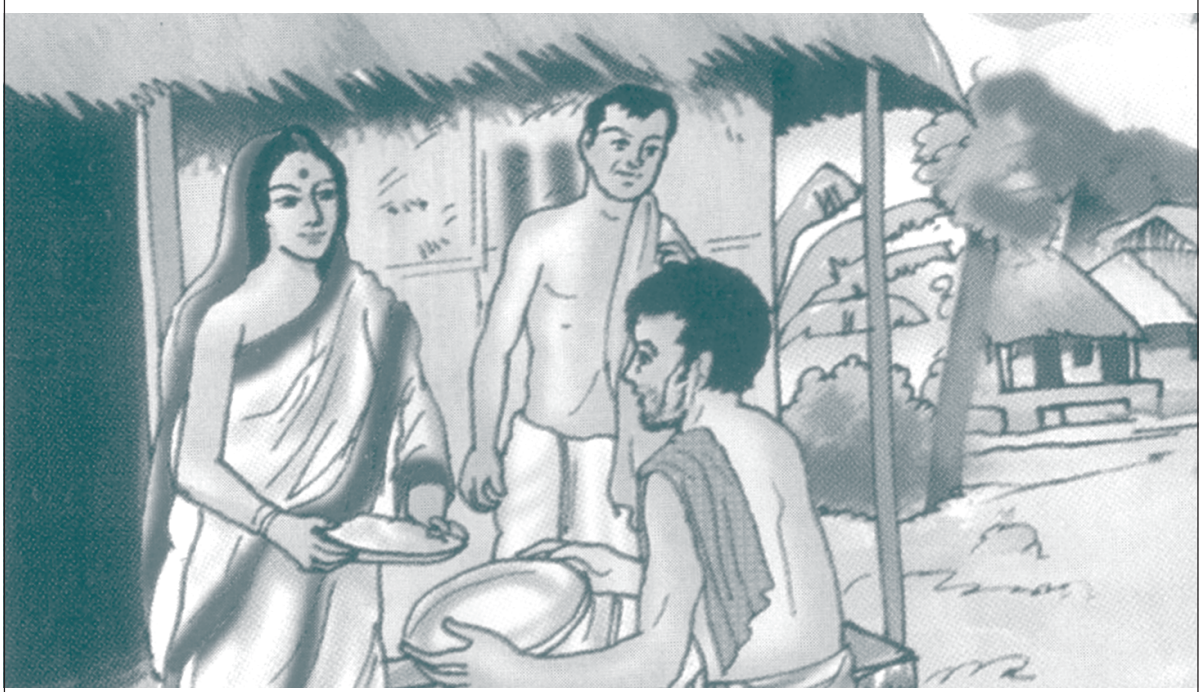

কালিদাস দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী কামিনীসুন্দরীকে গ্রামের সকলেই ভালবাসে, ভক্তি করে। তাঁরা বিত্তশালী ছিলেন না— তবু দোল, দুর্গোৎসব, দান-ধ্যান সবই সাধ্যমতো করতেন। *(ক্রমশ)*